বিজ্ঞাননির্ভর গল্প

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ দুলাল বল
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৬১

প্রচ্ছদ ঃ দেবাশীষ দেব

মুদ্রাকর ঃ মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৮

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ স্থঞ্জয় চক্রবর্তী (রঙ্কুলাল)

স্নেহাস্পদেষু—

—আঃ দাদু

ভূমিকা

বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের মানুষের মধ্যেই একটা বিজ্ঞান-মানসিকতা গড়ে উঠেছে—কোথাও একটু আগে, কোথাও একটু পরে। আমাদের দেশও বাদ যায় নি। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই, একটি নতুন ধরণের বা নতুন স্বাদের কথাসাহিত্যের আমদানী হয়েছে যাকে বলা হয় বিজ্ঞান নির্ভর গল্প বা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। কেউ কেউ বলেন "কল্পবিজ্ঞান"। শেষোক্ত নামটি, মনে হয়, প্রথম দু'টির তুলনায় একটু শ্রুতিমধুর।

এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ প্রতিনিয়তই চোখের সামনে দেখছে বিজ্ঞানের রকমারি কলাকৌশল, দৈনন্দিন জীবনে নানা রকম বৈজ্ঞানিক তথ্যের কার্যকরী প্রয়োগ। ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যেও একটা বিজ্ঞান-মানসিকতা অনিবার্যভাবে গড়ে উঠেছে। এর কার্যকারণ জানবার জন্যও তারা ক্রমেই উৎসাহী হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানের দিকে তাদের উৎসাহ ও কৌতূহল বাড়াবার পক্ষে এ-সব গল্পেরও কিছুটা ভূমিকা হয়তো আছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্য-কাহিনী ছোটদের বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মন প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, সর্বযুগেই করে আসছে। এমন কি যে সব বয়স্ক ব্যক্তি তাঁদের শিশুমন বা আরও ভালো করে বললে, কিশোর-মনটিকে এখনও হারিয়ে ফেলেন নি,—তাঁদেরকেও যে করে না এ কথা বলতে পারি না। কিন্তু ঐ সব রহস্যের সমাধান অলৌকিক ভাবে না হয়ে যদি বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে হয় তবে তা আরও আকর্ষণীয় হতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শিক্ষাপ্রদ হওয়াও অসম্ভব নয়। এইখানেই গতানুগতিক রহস্য-গল্পের সঙ্গে বিজ্ঞাননির্ভর গল্প বা কল্পবিজ্ঞানের পার্থক্য।

তবে একটা দিকে লেখককে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে। বিজ্ঞানের কতকগুলি প্রাথমিক সূত্র বা তথ্য আছে যা অস্বীকার করে লিখলে তাকে বিজ্ঞাননির্ভর গল্প বলা চলে না। এইসব সূত্রকে অস্বীকার না করেও সার্থক রহস্য-কাহিনী দাঁড় করানো যায়। আজ যা সম্ভব তা নিয়ে তো বটেই, আজ যেটাকে অসম্ভব মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনার কথা ভেবেও চলতে পারে। তবে, ঐ যা বললাম, বিজ্ঞানের মূল সূত্র, নিয়মকানুন অস্বীকার করে কখনোই নয়। গাছ থেকে আপেল খসে পড়লে সেটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুযায়ী নীচে পড়বেই। তাকে যদি নীচে না ফেলে ওপরে টেনে নেওয়া হয় তা হলে তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা অবশ্যই দিতে হবে এবং সে যুক্তি বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করে দিলে

চলবে না। এককথায়, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের লেখককে এদিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি করাই এসব গল্পের একমাত্র কাজ নয়, সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে বিজ্ঞান সচেতন করা এবং বিজ্ঞানের যাদুকরী শক্তির দিকে আকৃষ্ট করে তাকে বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলাও নিশ্চয়ই এর একটা কাজ। কল্পবিজ্ঞান লিখতে গেলেই যে অজানা গ্রহলোকের বা অনুরূপ কাল্পনিক পরিবেশের বা অসম্ভব রকম কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে পাঠককে নিয়ে যেতে হবে এ আমি বিশ্বাস করি না, বরঞ্চ অনুচিত বলেই মনে করি, কারণ যা বিজ্ঞানের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাকে বড় জোর "ফ্যাণ্টাসী" বলা যেতে পারে,—বিজ্ঞাননির্ভর বলা চলে না। আমাদের আশপাশে এমন অনেক সামান্য ঘটনা ঘটছে যার মধ্যে চমৎকার কল্পবিজ্ঞান রচনা করা যেতে পারে।

গত পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে নানা পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে পূজাবার্ষিকী গুলিতে অনেকগুলি এই ধরণের গল্প লিখেছি, এখনও লিখে যাচ্ছি, বেতারেও কিছু কিছু প্রচারিত হয়েছে। শুধু গল্প নয়, সেই সঙ্গে কয়েকখানি এই ধরণের ছোট বড় উপন্যাসও ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছে। সেগুলি এতদিন নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এখন দেখছি সংখ্যায় সেগুলি নেহাৎ কম হবে না। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেগুলি একত্র সংকলন করে কয়েক খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন করেছেন। এজন্য তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রীমান্ রবীন বলকে। তাঁর উৎসাহ না পেলে গল্পগুলো হয়তো পুরোনো পত্র-পত্রিকার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকত।

গল্পগুলি যাদের জন্য লেখা তাদের যদি মনোরঞ্জন করতে পারে এবং বিজ্ঞানের প্রতি তাদেরকে কৌতূহলী করে তুলতে পারে তবেই পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

সূচীপত্র

লুপ্তধন

—এক—

কার্তিক মাস। একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। এই সময়টা সন্ধ্যার পর বেশ হিমও পড়ে। সাবধান না হলেই, ব্যস্, সেই যে কাশি সুরু হবে—পাকা একটি মাসের ধাক্কা।

কাশীপ্রসাদ বাবু বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলেন।

বাড়ি ফিরতে আজও রাত দশটা বেজে যাবে মনে হচ্ছে। রাস্তা তো আর কমখানি নয়। সকালে ভেবেছিলেন আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠবেন, ফিরবার পথে গোলমণ্ডী থেকে কিছু সওদা করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তার কি আর জো আছে?

অথচ কিছু বলাও যায় না। ডাক্তার দ্বিবেদী এ অঞ্চলের বেশ একজন নাম-করা—গণ্যমান্য লোক। শুধু ডাক্তার হিসেবেই বড় ন'ন, পণ্ডিত ব্যক্তি বলেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। সময়ের দাম তাঁর বড় কম নয়। তা সত্ত্বেও তিনি যখন নিজে থেকে উঠবার নাম করছেন না তখন কাশীপ্রসাদ বাবুর পক্ষে তাঁকে সে-কথা মনে করিয়ে দেওয়াটা ভালো দেখায় না।

অতএব?

অতএব আজও কাশীপ্রসাদ বাবু কালকের মতই বসে বসে ভাবছিলেন।

শুধু কালকে কেন, গত কয়েক দিন ধরেই এই রকম চলছে।

সরকারী গ্রন্থাগার, তারই একটি অংশ হচ্ছে এই পুঁথিশালা। আর কাশীপ্রসাদ বাবু হচ্ছেন সেই পুঁথিশালার অধ্যক্ষ—অর্থাৎ সোজা কথায় গ্রন্থাগারিক। নানারকম হাতে-লেখা পুঁথি শেলফের ওপর স্তূপাকার ভাবে সাজানো। এর মধ্যে কতক আবার খুবই দুষ্প্রাপ্য। সেগুলির আর দ্বিতীয় কপি নেই। কতকগুলি খুবই পুরোনো। এত পুরোনো যে লেখা প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে উঠে যাবার গতিক। কাগজও এত মুচমুচে হয়ে গেছে যে হাতে টিপলে বোধ হয় পাঁপর ভাজার মতন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। আর, সবই কি কাগজ? মোটেই না। কতক তাল-পাতার ওপর লেখা, কোনটা বা ভূর্জপাতার ওপর। আবার এমন পুঁথিও আছে

যা কিসের পাতার ওপর লেখা তা কাশীপ্রসাদ বাবু নিজেও সঠিক জানেন না। আর জানেন না বলেই জানেন যে সেগুলো আরও দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। শুধু পোকামাকড়ের হাত থেকে এগুলোকে রক্ষা করাই বেশ কঠিন কাজ, তার ওপর আরও নাকি শত্রু আছে এদের। দুষ্প্রাপ্য পুঁথির ক্রেতার অভাব নেই দেশে। তেমন তেমন খদ্দের পাকড়াতে পারলে একখানা পুঁথি থেকেই বেশ দাঁও মেরে নেওয়া যেতে পারে। তাই কাশীপ্রসাদ বাবুকে সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়। কখনও নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি বেরোন না। অর্থাৎ পুঁথিশালা যখন বন্ধ হয় তখন নিজেও একবার উঠে, চারদিক্ ভালো করে দেখেশুনে পরীক্ষা করে, তবেই বেরোন।

কিন্তু বিপাকে ফেলেছেন এই ডাক্তার দ্বিবেদী। আজ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে রোজ সন্ধ্যাবেলা রোগী দেখা শেষ করেই তিনি এই পুঁথিশালায় এসে হাজির হচ্ছেন আর অনেক রাত পর্যন্ত ঐ সব দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। আর, আগেই বলেছি, ডাক্তার দ্বিবেদী এ অঞ্চলের বেশ খ্যাতনামা লোক। তাই কাশী-প্রসাদ বাবুকেও, তিনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত, বসে বসে অপেক্ষা করতে হচ্ছে —অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও।

"দেখুন, শুনছেন ?"

কাশীপ্রসাদ বাবুর ভাবনাস্রোতে হঠাৎ বাধা পড়ল। চমকে দেখেন দরজায় দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়, স্বয়ং ডাক্তার দ্বিবেদী। কখন যে তিনি পুঁথি রেখে উঠে এসেছেন টের পান নি কাশীপ্রসাদ বাবু।

"দেখুন, আচ্ছা, নামচি জং মনাস্টারী থেকে কিছু পুরোনো পুঁথি এসেছে না ? সেগুলো কি এখনও ক্যাটালগিং হয় নি ? দেখছি না তো সেগুলো।"

"না, সেগুলো এখনও ঠিকমত পড়া যায় নি কিনা, তাই দেরী হচ্ছে। শুনছি নাকি হরফগুলো ঠিক টিবেটান নয়, আর ভাষাটাও মনে হচ্ছে একটু কেমন কেমন। সহদেব পণ্ডিত বলেছিলেন, ওগুলো বোধ হয় কোনও তান্ত্রিক ভাষা।"

ডাক্তার দ্বিবেদী একটু মুচকে হাসলেন, তারপর হাসিমুখেই বললেন, "তা দিন না আমাকে, একটু নাড়াচাড়া করে দেখি। পড়তে পারি তো ভালো, নইলে তুলে রাখবেন। পড়বার জন্যেই তো পুঁথি।"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই।"—আমতা আমতা করতে করতে কাশী-প্রসাদ বাবু পাশের ঘরে একটা আলমারীর দিকে এগিয়ে গেলেন—সম্ভবতঃ

ঐখানেই পুঁথিগুলো আছে। আইন মতে ক্যাটালগিং হবার আগে পুঁথি বার করে দেওয়া এখানকার নিয়ম নয়, কিন্তু ডাক্তার দ্বিবেদীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হতে পারে এবং পুঁথিশালার কর্তার হয়তো সে ক্ষমতাটুকু আছে।

একটু পরেই দেখা গেল ডাক্তার দ্বিবেদী একখানা পুঁথির মধ্যে যেন ডুবে গেছেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। কাশীপ্রসাদ বাবুর বাড়ি পৌঁছতে আজও কত রাত হবে কে জানে?

—দুই—

শহরের অভিজাত পল্লীতে ডাক্তার দ্বিবেদীর বসতবাড়ি। বাড়ির সামনের দিক্‌টায় তাঁর চেম্বার এবং তার পাশেই তাঁর ও. টি. অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটার। ডাক্তার দ্বিবেদী শুধু বড় ডাক্তার ন'ন, একজন নামকরা সার্জেন বা অস্ত্র-চিকিৎসকও। আগে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এখন বয়স হয়ে যাওয়ায় আর হাসপাতালে যান না—বড় বড় অপারেশনগুলোও বাড়িতেই করেন। তাঁর অপারেশনের ঘরটিও তাই আধুনিক সব রকম সরঞ্জামে ভর্তি।

কিন্তু অপারেশন থিয়েটারের চাইতেও বোধ হয় উল্লেখযোগ্য তাঁর সযত্ন-সংগৃহীত লাইব্রেরীটি। বড় ডাক্তারের বাড়িতে অপারেশনের ভালো ভালো সাজসরঞ্জাম থাকবে এ তো স্বাভাবিক,—ব্যবসার খাতিরেই সেটা রাখতে হবে, কিন্তু একজন অত্যন্ত ব্যস্ত ডাক্তারের পক্ষে বাড়িতে একটা লাইব্রেরী পোষার মধ্যে বাহাদুরী আছে বৈ কি! লোক-দেখানো বড়লোকের বাড়িতে যে রকমটা অনেক সময় দেখা যায়—যাকে কবি বলেছেন, "মেহগিনীর মঞ্চ যুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ" —এ লাইব্রেরী যে সে রকম নয় তা শেল্‌ফ্‌ থেকে যে কোন বই নামালেই বোঝা যাবে। সবগুলিই দস্তুর মত পড়া হয়েছে—অনেকগুলি খুঁটিয়ে পড়া হয়েছে এবং রঙিন পেন্সিলে দাগানো ইতস্ততঃ জায়গাগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। কি ধরনের বই জানতে ইচ্ছে করছে হয় তো? ডাক্তারী সম্পর্কীয় বই আছে অঢেল —বিশেষ করে নানান্ দেশের অস্ত্রচিকিৎসা সম্পর্কে লেখা নানান্ রকম সব বই। আরো আছে প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থ। শুধু সংস্কৃত নয়,—পালি, প্রাকৃত, এমন কি আরবী ভাষায় লেখা বইও আছে। ডাক্তার দ্বিবেদী যে ভালো সংস্কৃত জানেন বইগুলি দেখলেই তার প্রমাণ মেলে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বই, তান্ত্রিক শাস্ত্রের বই, ধর্মশাস্ত্রের বই—কী নেই তার মধ্যে? শুধু সংস্কৃত নয়,—আরবী এবং ফারসী ভাষায়ও তাঁর দখল আছে। তা ছাড়া কিছু কিছু নেপালী আর তিব্বতী ভাষাও

যে জানা আছে তার পরিচয় তো আমরা আগেই পেয়েছি। চিকিৎসাচর্চার সঙ্গে ভাষাচর্চাও বোধ হয় তাঁর একটা শখ।

এই লাইব্রেরী ঘরেই সেদিন ডাক্তার দ্বিবেদী আপন মনে পায়চারি করছিলেন।

কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে তিনি যে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ খুবই উত্তেজিত হয়ে আছেন তা অনুমান করা কষ্টকর নয়। আগেই বলেছি ডাক্তার দ্বিবেদীর বয়স হয়েছে ; অন্ততঃ ষাটের কম নয়। ভিক্টোরিয়ান যুগের ফ্যাশন মত লম্বা দাড়ি রেখেছেন তিনি। তাতেও দস্তুরমত পাক ধরেছে।

টেবিলের ওপর ২।৩ খানা বই খোলা পড়ে আছে, আর আছে তারই পাশে এলোমেলো ছড়ানো কতকগুলি ক্লিপ্-আঁটা কাগজ—সম্ভবতঃ তাঁরই লেখা কোনও নোট। হয়তো লিখতে লিখতেই উঠে পায়চারি শুরু করেছেন। শীতের শুরু হলেও ইলেকট্রিক পাখা বন্ধ করেন নি তিনি। বন্ বন্ করে ঘুরছে পাখা আর সেই হাওয়ায় ফুর ফুর করে উড়ছে তাঁর গায়ের হাঁটু-পর্যন্ত-নামানো লম্বা সাদা কোটটা। তবে কি ডাক্তার দ্বিবেদী এর একটু আগেই তাঁর ও-টি-তে বসে কিছু করছিলেন ?

ওটির মধ্যে অবশ্য বাইরেকার কারো ঢুকবার হুকুম নেই। নার্স এবং সহকারীদেরও না। দরকার হলে, এবং ডাক পড়লে, তবেই কেবল তারা ওই ঘরে ঢুকতে পারে, নইলে নয়।

অপারেশনের ঘরে উঁকি মারলে কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ে না। তবে টেবিলের ওপরে একটা মজার জিনিস পড়ে আছে। আর কিছু নয়, একটা জন্তুর কাটা কান—তবে কী সে জন্তু তা বোঝা মুশকিল। কানটার ওপর নানাভাবে ছুরি চালানো হয়েছে—যেন তার শিরা-উপশিরা, এমন কি স্নায়ুগুলো নিয়েও ঘাটাঘাটি করা হয়েছে। ঘরের এক কোণে দু'টো ছোট ছোট খাঁচায় আরও কয়েকটি ছোট ছোট প্রাণী রয়েছে। এগুলো কিন্তু জ্যান্ত। একটা খাঁচায় একটা বেশ বড়সড় বাদুড় থেকে থেকে পাখা ঝটপট করছে। আর একটা খাঁচার এক কোণে আর একটা কি জন্তু জড়সড় হয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছে। হয়তো পেঁচা বা ঐ রকম কোনও পাখি। একটা টিকটিকির-মত-বেঁটে-পা কুকুরও রয়েছে। একটা কাঠের বাক্সের ভিতর লেজ গুটিয়ে ঘুমোচ্ছে।

তাহলে কি ডাক্তার দ্বিবেদী আজকাল মানুষ ছেড়ে দিয়ে জীবজন্তুর চিকিৎসা শুরু করেছেন ? শেষে কি তাঁকে ভেটেরিনারী সার্জেন বলে পরিচয় দিতে হবে ?

কিন্তু আজেবাজে ভেবে লাভ নেই। সত্যি ব্যাপারটা না জানলে এ সব

ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করবার কোনও মানে হয় না। আমরাও তাই আপাততঃ তা থেকে বিরত থাকলাম। বরঞ্চ, তার চাইতে ডাক্তার দ্বিবেদীর হালচাল একটু আড়াল থেকে লক্ষ করা যাক্।

খানিকক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করে ডাক্তার দ্বিবেদী আবার টেবিলে এসে বসলেন। চশমাটা নাকের ডগায় আর একটু ভালো করে নামিয়ে দিয়ে সামনের খোলা একখানা বই-এর কতকগুলি লাইন যেন পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর অধৈর্য হয়ে টেবিলে-রাখা কলিং বেলটা সজোরে টিপে দিলেন।

একটু পরেই দরজায় কার ছায়া পড়ল। খাকি ফতুয়া পরা একটি সটিকি হিন্দুস্থানী ভৃত্য এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"বাহারমে কোই আদমী বয়ঠল হ্যায় ?" —প্রশ্ন করলেন ডাক্তার দ্বিবেদী।

"জী হঁা। একঠো মহারাজ বাবু।" তারপর একটু যেন অনুযোগের সুরেই বলল, "আধাঘণ্টাসে বসিয়ে আছেন। খোবোব দিতে হামার ডোর লাগল।"

"সেলাম দেও।"

বাতাসে শিখা আন্দোলিত করে লোকটি দ্রুতপায়ে মহারাজকে সংবাদ দিতে ছুটল।

—তিন—

মহারাজ মানে সন্ন্যাসী। কিন্তু ঘরে যিনি ঢুকলেন তিনি ঠিক সন্ন্যাসী ন'ন। তবে চেহারা এবং পোশাকপরিচ্ছদ দেখে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং পরনের কাপড়খানাও সাদা নয়—লাল রং-এ ছোপানো। ডাক্তার দ্বিবেদী তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অনাবশ্যক বাক্যালাপ না করে দু'জনে মিলে সংস্কৃত বইএর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। অবশ্য তার আগে ডাঃ দ্বিবেদী একবার উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। অর্থাৎ আলোচনাটা তিনি নিভৃতেই করতে চান। দরজা ভেজানোটা তাঁর অতিরিক্ত সতর্কতা, কারণ বাড়ীতে বাড়তি লোক নেই বললেই চলে। ডাক্তার দ্বিবেদীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কিছুই নেই। এ-পর্যন্ত বিয়ে করবারই ফুরসৎ পান নি তিনি।

এর দিন কয়েক পরের ঘটনা। কয়েক দিন ধরে আবহাওয়াটা বড় খারাপ যাচ্ছে, সারাদিন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। অসময়ের বৃষ্টি, কাজেই শীতটাও যেন একটু অসময়েই জাঁকিয়ে বসেছে। কাশীপ্রসাদ বাবুর বরাবরই

একটু সর্দির ধাত—ঠাণ্ডা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। ফলে একদিনের ঠাণ্ডাতেই তাঁর গলা-টলা ব্যথা হয়ে সে এক বিশ্রী কাণ্ড। পর পর দু'দিন আপিস কামাই করে তৃতীয় দিনে গলায় কম্ফর্টার, পায়ে গরম মোজা, হট্‌ওয়াটার ব্যাগ, নুনের পুঁটলী, আর পকেট ভর্তি নানান্ রকম ওষুধের বড়ি নিয়ে তিনি কোন রকমে আপিসে এলেন।

খবর নিয়ে জানলেন, এ ক'দিন এই দুর্যোগে বাইরের পড়ুয়ারাও বড় কেউ একটা আসেন নি, কেবল দু'-একটি রিসার্চ স্টুডেন্ট ছাড়া। তবে হ্যাঁ, ডাক্তার দ্বিবেদী রোজই এসেছেন, বরঞ্চ অন্যান্য দিনের তুলনায় আরো বেশি করে সময় কাটিয়ে গেছেন ; আর কত পুঁথিই যে ঘেঁটেছেন তার আর লেখাজোখা নেই! পরশু তো তাঁকে তোলাই যাচ্ছিল না। ভাগ্যিস বাড়ি থেকে টেলিফোন এল—একটা জরুরী কল্ এসেছে, না গেলেই নয়। তা প্রথমটা তাতেও বেঁকে বসেছিলেন তিনি। শেষে কি মনে করে, হয়তো পেশার ভদ্রতা মেনে চলবার উদ্দেশ্যেই. অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে উঠতে হয়েছিল।

কাশীপ্রসাদ বাবু শুনে মনে মনে একটু হেসে নিলেন। নাঃ. লোকটা বোধ হয় ক্ষেপে গেছে। নইলে নিজের আসল কাজ ফেলে এই সব শখের ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামায় ?

কিন্তু আজ ক্যাটালগিং-এর কাজটা শুরু করতেই হবে। নামচি জং মনাস্টারী থেকে যে পুঁথিগুলো এসেছে সেগুলো নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান্। ঠিকমত পাঠোদ্ধার না হলেও ওগুলো নিয়ে, খুব সম্ভবতঃ, নতুন করে গবেষণা শুরু হবার সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া পুঁথিগুলো যেভাবে পাওয়া গেছে তাও কম বিস্ময়কর নয়। যাঁরা এগুলি আবিষ্কার করেছেন তাঁরা কেউই ঐতিহাসিক বা ভাষাতত্ত্ববিদ্ ন'ন। হিমালয়ের ওপরকার কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তুর সন্ধানে একদল প্রাণিবিজ্ঞানী যে অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁরাই এগুলি উদ্ধার করে এনেছেন।

সেও এক ভারি মজার ব্যাপার বলা যেতে পারে। ছোটখাট এই অভিযাত্রী-দলের নেতা ছিলেন এক তরুণ বাঙ্গালী বিজ্ঞানী। অবশ্য দলে সঙ্গীদের মধ্যে অন্য প্রদেশের লোকও ছিলেন। নেপাল সরকার থেকে যথারীতি অনুমতিপত্র নিয়ে তাঁরা প্রায় ১৬ হাজার ফুট ওপরে উঠে যান। ঐ সময় হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, তাঁবুটাঁবু ভেঙ্গে তছ্ নছ্ হয়ে যায়। কি করবেন ভেবে না পেয়ে সবাই যখন পাগলের মত ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছেন তখন দূরে, আবছা কুয়াশার আড়ালে, কালো মত বিরাট কি একটা তাঁদের চোখে পড়ল। মরি-বাঁচি করে

সেই দিকে ছুটে চললেন তাঁরা। গিয়ে দেখেন অবাক কাণ্ড! পাহাড়ের ওপরে লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনপ্রাণিহীন নির্জন প্রান্তরে একটি পরিত্যক্ত গুম্ফা পড়ে রয়েছে। গুম্ফা অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির। তিব্বতীরা, এমন কি এ অঞ্চলের লোকেরাও ঐ নামে মন্দিরকেই বোঝায়। যাই হোক, তখনকার মত সেই গুম্ফাই অভিযাত্রীদের জীবন রক্ষা করে। . . . .

পরদিন ঝড় থামলে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ হ'ল তাঁদের। পাহাড়ের ওপর একটা সুপরিসর গুহার ওপর পাথর ফেলে ফেলে অনেকটা গুহা-মন্দিরের মত করে তৈরি করা হয়েছে এই গুম্ফাটি। কিন্তু এখন সেটা একেবারেই পরিত্যক্ত। খুব সম্প্রতি ওখানে কেউ থাকত বা অন্ততঃপক্ষে আসা-যাওয়া করত এমনও মনে হয় না।

কিন্তু পরিত্যক্ত হলেও অতীত দিনের কিছু কিছু স্মারক চিহ্ন এখনও ওর ভিতরে রয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা কুলুঙ্গিতে রাখা লাল খেরো কাপড়ে বাঁধা কতকগুলি পুঁথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কারণেই হোক, মন্দিরটি যখন পরিত্যক্ত হয় তখন অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই পুঁথিগুলোও সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ হয় নি কিংবা ভুল হয়ে গেছে। যাই হোক, হয়তো ওগুলির মধ্যে জায়গাটির সম্বন্ধে কিছু রহস্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এই আশায় অভিযাত্রীদের নেতা পুঁথিগুলো সংগ্রহ করেন এবং ফিরে এসে ওগুলিকে সরকারী পুঁথিশালায় পাঠিয়ে দেন। পুঁথিগুলোর ভাষা এবং অক্ষর ঠিক ঐ অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা আর অক্ষরের মত নয়। এই সব কারণে স্বভাবতঃই পুঁথিগুলো আগ্রহের সৃষ্টি করেছে এবং ওর ভিতরকার বিষয়বস্তু জানার জন্য কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কাশীপ্রসাদ বাবুর হেপাজতে প্রাথমিক কাজগুলো হয়ে গেলেই বিশেষজ্ঞেরা কাজে নামবেন এই রকম ঠিক হয়ে আছে। তাই কাশীপ্রসাদ বাবু স্বভাবতঃই একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছেন।

সবসুদ্ধ সাতাশখানা পুঁথি। তার কোনটাই খুব পুরু নয়। • প্রতি পুঁথিতে গড়পড়তা বড়জোর একশ' কি দেড়শ' করে পৃষ্ঠা আছে। তবে পুঁথিগুলো যে খুব পুরোনো যুগের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কাশীপ্রসাদ বাবু একজন বেয়ারাকে সঙ্গে করে পুঁথিগুলো নামিয়ে ফেললেন। বেয়ারা গুণে গুণে সেগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে লাগল। এক—দুই —তিন—পাঁচ—সাত—দশ, তারপরে বারো, চৌদ্দ—পনেরো—ষোল—সতেরো —আঠারো—উনিশ—বিশ।

"থামলে যে! আরও সাতখানা আছে।"

বেয়ারা সবিনয়ে জানাল, "আজ্ঞে না বাবু, আর নেই। সবসুদ্ধ বিশখানাই রয়েছে।"

"বল কি? ভাল করে দেখ। আশেপাশে কোথাও ঢুকে গেছে বোধ হয়। মোট সাতাশখানা পুঁথি। আমার বেশ মনে আছে যে!"

কিন্তু না, আর পাওয়া গেল না, কাশীপ্রসাদ বাবু তখন ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। শুরু হ'ল তন্ন তন্ন করে খোঁজা। নিজেও খুঁজতে শুরু করলেন। কেউ যদি তুলবার সময় ভুল করে অন্য পুঁথির মধ্যে গুঁজে দিয়ে থাকে। কিন্তু না, কোথাও নেই। সাত সাতখানা পুঁথি লোপাট হয়ে গেছে।

কাশীপ্রসাদ বাবুর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

কে—কে নিতে পারে ও পুঁথি? কার এত গরজ বা সত্যি করে বললে বলতে হয় কার এই দুঃসাহস? পুঁথিগুলোর মধ্যে কি লেখা আছে তাই কেউ জানে না—কাজেই কেউ লুকিয়ে বিক্রী করে দাঁও মারবার মতলবে ওগুলো সরিয়েছে এমন মনে হয় না। তা ছাড়া সরকারী সম্পত্তি, ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি হবে তা কি সে জানে না?

পুঁথি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন একমাত্র ডাক্তার দ্বিবেদী। কিন্তু তাঁকে তো আর সন্দেহ করা যায় না।

তবে?

ভাবতে ভাবতে কাশীপ্রসাদ বাবুর সত্যি আবার কাশি এসে গেল। পকেট থেকে কয়েকটা বড়ি বার করে তাড়াতাড়ি মুখে পুরে নিয়ে আবার ভাবতে লাগলেন তিনি।

তবু একবার ডাক্তার দ্বিবেদীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। অন্ততঃ পুঁথিগুলো যে পাওয়া যাচ্ছে না সে খবরটাও তাঁকে জানানো উচিত, কারণ তাঁর নিজেরও দরকার হতে পারে।

কাশীপ্রসাদ বাবু তখনই টেলিফোন করলেন।

জবাব এল এক হিন্দুস্থানীর কণ্ঠে; "ডক্টর সাব শহরসে বহার হুয়ে গেসেন। কুথায় কুছ মালুম নেই। কোবে ফিরবেন? সে ভি হামি কুছু জানে না।"

—চার—

সত্যি, ডাক্তার দ্বিবেদী কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন! বন্ধুবান্ধব, সহকারী, কর্মচারী, চাকর-বাকর কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় চলে গেছেন তিনি কেউ বলতে পারে না।

পুঁথিশালা থেকে যথাসময়ে পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছিল। পুলিসও কেতামাফিক তদন্ত আরম্ভ করেছিল, কিন্তু কোন হদিস পাওয়া যায় নি। না পুঁথিগুলোর, না ডাক্তার দ্বিবেদীর। জলজ্যান্ত লোকটা অমন "রোরিং প্র্যাকটিস" ফেলে কোথায় চলে যেতে পারেন? না কি কোন বিপদ্-আপদ্ ঘটল? ক্রমে শেষের সন্দেহটাই প্রবল হয়ে উঠল।

কিন্তু ঠিক এরই কাছাকাছি সময়ে খবরের কাগজে যে আর একটি ছোট্ট খবর বেরিয়েছিল অনেকের হয়তো সেদিকে দৃষ্টি পড়ে নি। সেও এক নিরুদ্দেশের খবর—একটি নয়, এক জোড়া। তবে যারা নিরুদ্দেশ হয়েছিল তারা কেউই ডাক্তার দ্বিবেদীর মত খ্যাতনামা লোক নয়—নেহাৎই দু'টি বালক। তবে দু'টিই শহরের দু'টি শিক্ষিত পরিবারের ছেলে এবং স্কুলেও তুখোড় ছেলে বলেই পরিচিত। এমনিতে তাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায় নি কিন্তু যে ভাবে তারা অপহৃত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তার পদ্ধতিটা প্রায় এক। কাজেই ঐ দুটি ব্যাপারই যে একই দলের সাহায্যে হয়েছে এ রকম সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পুলিস যে এ ব্যাপারেও একেবারে হাত গুটিয়ে বসেছিল এমন নয়। শহরের এবং আশপাশের দাগী ছেলেধরাদের আড্ডায় ঢুঁ দিয়ে তারা সবাইকে জেরাটেরা করেছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও তাদের আর দশটা তদন্তের মতই কোন ফল হয় নি।

ছেলে দু'টির নাম? একজনের নাম বেশ সাদাসিধে,—শ্রীমান্ অনুতোষ বাগচী। আর একজনের নাম একটু খটমটে,—সুব্রহ্মণিয়ম্ ভেঙ্কট রঙ্গনাথন্। অবশ্য সংক্ষেপ করেও বলা যায়, তা হলে দাঁড়ায় এস. ভি. রঙ্গনাথন্। আমরা বরঞ্চ দু'জনেরই নামের কিছু কিছু বাদ দিয়ে অতঃপর প্রথম জনকে অনুতোষ এবং দ্বিতীয় জনকে রঙ্গনাথন্ বলে উল্লেখ করব।

অনুতোষের বাবা বিশ্বতোষ বাগচী একজন অ্যাডভোকেট। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে তাঁর। মেয়েটি অর্থাৎ রুমা-ই বড়, স্থানীয় গার্লস কলেজের

ছাত্রী সে। অনুতোষ এখনও স্কুলের গণ্ডী ছাড়ায় নি, কিন্তু বয়সের তুলনায় খবর রাখে অনেক, নানাদিকে তার উৎসাহ। মাস্টার মশাইরা বলেন—ছেলে তো নয়, একটা জ্যান্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। রঙ্গনাথনের বাবা মিঃ বরদাচারী একজন বড় সরকারী চাকুরে। কৃতী ছাত্র হিসেবেই তিনি সে চাকরী পেয়েছিলেন, আর তাঁর সেই ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব তাঁর ছেলের মধ্যেও খানিকটা সংক্রমিত হয়েছিল। বরদাচারীরও দু'টি সন্তান—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। রঙ্গনাথন্ স্কুলের ছাত্র। মেয়েটি, অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী, কলেজে পড়ছে।

দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক্ সমাজের এবং পৃথক্ পরিবারের ছেলে প্রায় একই সময়ে রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে গেল! ব্যাপার দু'টোর মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। খবর পেয়ে বরদাচারীই একদিন এলেন বিশ্বতোষ বাবুর বাড়িতে। দু'জনেরই ব্যথা এক জায়গায়, সুতরাং ছেলের সন্ধান না পেলেও ঘনিষ্ঠতা হঠাৎ বেড়ে গেল এবং ক্রমে সেটা কর্তাদের মধ্যে থেকে দুই পরিবারের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। ফলে রুমা আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও গড়ে উঠল একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। রুমা ছোট ভাইটিকে খুবই ভালবাসিত। রাজলক্ষ্মীও রঙ্গনাথন্ বলতে প্রায় অজ্ঞান। সুতরাং বন্ধুত্বের বাঁধনটা সমবেদনার সুতোয় যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠল।

ছুটির দিনে দুই বান্ধবী একবার না একবার একত্র হ'তই। রুমা যেত রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী, নয়তো রাজলক্ষ্মী আসত রুমাদের বাড়ী। তখন যে সব গল্প হ'ত তার বেশির ভাগই হ'ত নিজের নিজের ভাইকে কেন্দ্র করে। ফলে রাজলক্ষ্মী অনুতোষকে চাক্ষুষ না দেখলেও তার প্রায় নাড়ীনক্ষত্র জেনে গিয়েছিল, তেমনি রুমাও জেনে গিয়েছিল রঙ্গনাথনের যাবতীয় টুকিটাকি সংবাদ।

একদিন রাজলক্ষ্মী একখানা বিরাট বই বার করে দেখছিল। রুমা ঘরে ঢুকেই বলল, "কি পড়ছিস্? বাপ, কি বিরাট বই!"

রাজলক্ষ্মী ম্লান হেসে বলল, "পড়ছি না, ছবি দেখছি। হ্যাঁ, বিরাটই বটে, তবু এ তো কেবল একটা ভলিউম্। এ রকম আরও পাঁচ ভলিউম আছে। রঙ্গনাথনের ভারি প্রিয় বই ছিল এটা। দুনিয়ার যাবতীয় জীবজন্তুর ছবি আছে এতে। শুধু সাধারণ ছবি নয়, এক একটা জীবজন্তুর হরেক রকম ছবি রয়েছে। রঙ্গনাথনের কাছে এর সবগুলো ছবিই প্রায় মুখস্থ ছিল। কোন্ জানোয়ারের হালচাল কি রকম, সব ছিল তার ঠোঁটের কোণে।"

রুমাও ম্লান হাসি হেসে বলল, "ঠিক অনুতোষের মতন। তার আবার শুধু

ছবি দেখা নয়, জ্যান্ত জীবজন্তু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা চাই। বেড়াল, কুকুর, খরগোস, গিনিপিগ্, পায়রা, টিয়া, কাকাতুয়া—কত রকম পশুপাখিই না পুষত! শুধু কি পশুপাখি? পোকামাকড়ও বাদ দিত না সে। প্রজাপতি, মথ, গুটিপোকা, টিপপোকা, আরও কত রকম পোকামাকড় সে সংগ্রহ করেছিল! অবশ্য সব জ্যান্ত নয়।"

"নিশ্চয়ই ওরা দু'জনেই জুয়লজিস্ট হ'ত।"—রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল।

"আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু কোথায় গেল ওরা? আর কি দেখা পাব ওদের?"—কান্নায় ভেঙ্গে এল রুমার কণ্ঠস্বর।

—পাঁচ—

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ডাক্তার দ্বিবেদীর আর কোনও খবর পাওয়া যায় নি। অমুতোষ আর রঙ্গনাথন্‌কেও খুঁজে পাওয়া যায় নি আর। এমন কি সরকারী পুঁথিশালা থেকে যে পুঁথিগুলো উধাও হয়েছিল তারও কোন হদিস মেলে নি। লোকে সেগুলির কথা আস্তে আস্তে ভুলে আসছিল। বিশ্বতোষ বাবু এবং মিঃ বরদাচারীও নিয়তির বিধানকে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে সামলে নিয়েছিলেন। রুমা আর রাজলক্ষ্মীও, ভাইদের ভুলতে না পারলেও, মনকে অনেকটা শক্ত করে এনেছিল। তাদের নিজেদের ভিতকার বন্ধুত্বটা অবশ্য আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে দেশের হালচাল অনেকটা বদলেছে। বিদেশীর অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশী সরকার এটা-ওটা নিয়ে নানা রকম এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করে দিয়েছিলেন। কোন কোন ব্যাপারে সাফল্য লাভ করলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ছিলেন। সুযোগ বুঝে একদল ভূঁইফোঁড় সমাজবিরোধী লোক প্রায় রাতারাতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ছিনিমিনি শুরু করে দিয়েছিল তারা। জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি বেড়ে উঠছিল আর সেই সুযোগে আর একদল বাইরে থেকে আঘাত হানবার চেষ্টা করছিল বার বার। ফলে সাধারণ লোকের অনেক সমস্যাই প্রায় ধামাচাপা পড়বার যোগাড় হয়েছে। এ হেন অবস্থায় কে-ই বা খোঁজ করে অমুতোষের, কে-ই বা খোঁজ করে রঙ্গনাথনের? আর ডাক্তার দ্বিবেদীর তো বন্ধুবান্ধব ছাড়া তেমন আপনার জন কেউ ছিলই না। কাজেই তাঁকে নিয়েই বা ক'জন মাথা

ঘামাবে ? পুঁথি হারানোয় কাশীপ্রসাদ বাবু অবশ্য প্রথমটা বেশ ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে তারও একটা সুরাহা করে নিয়েছিলেন তিনি কোন রকমে।

কলকাতার দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকে প্রায় কাকদ্বীপ পর্যন্ত সুন্দর একটি রাস্তা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরে আর স্থলপথে বেশিদূর যাবার উপায় নেই তবে গঙ্গা এদিকটায় বেশ প্রশস্ত। আর, একটু এগোলেই, তার থেকে নানা খাঁড়ি-পথ খালের মত এদিকে ওদিকে বেরিয়ে গেছে। এই সবের সাহায্যে সুন্দরবনের ভিতর এদিক্ ওদিক্ নৌকো করে যেতে কোন বাধা নেই। আর খাস গঙ্গা ধরে এগোলে তো সটান গঙ্গাসাগরের কাছে সাগরতীর্থেই গিয়ে হাজির হওয়া যায়।

সেই গঙ্গাসাগরের কাছেই আপাততঃ আমাদের একটু আসতে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক গঙ্গাসাগরে নয়, আগেই বলেছি এ অঞ্চলে গঙ্গা থেকে অসংখ্য খাঁড়ি-পথ খালের আকারে এদিক ওদিক্ ছড়িয়ে রয়েছে। তারই একটা ধরে বনের মধ্যে বেশ কিছুটা এগোলে একটা ছোট দ্বীপের মতন পাওয়া যাবে—যা নাকি আশপাশের জঙ্গল থেকে একটু স্বতন্ত্র। চারধারে জল—অনেকটা পরিখার মত জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে, সেকালকার রাজারাজড়াদের কেল্লায় যেমন থাকত। ভিতরে গাছপালায় ঢাকা একটা উঁচু ময়দানের মত, লম্বা-চওড়ায় মাইলখানেক করে হবে নিশ্চয়ই। সেই ময়দানের মাঝখানে একটা উঁচু ঢিবির ওপর একটা ভাঙা বাড়ী— আরও ভালো করে বললে ভাঙা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। বহুদিনের পুরোনো—জরাজীর্ণ, কিন্তু আকারে বিশাল। মনে হয় কোন রাজা-মহারাজা এটা শখ করে বানিয়েছিলেন।

তা হোক, আপাততঃ এটাই আমাদের গন্তব্যস্থল।

—ছয়—

জনমানবহীন রাজ্যে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা রাজবাড়ির কথা শুনলে প্রথমটা হয়তো বিশ্বাস হতে চাইবে না। কিন্তু সুন্দরবনের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরাই বলবেন ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ সুন্দরবনের এখন যে হাল হয়েছে, তা বরাবরই ছিল না। এক সময়ে এর কোন কোন অঞ্চল সত্যিই সমৃদ্ধ ছিল। লোকজনের বসতি ছিল। পথ-ঘাট, দোকানপসরা কিছুরই অভাব ছিল না। সেই সব জনাকীর্ণ শহরে আর পাঁচটা বড় বড় শহরের মতই

লোক গিজ্ গিজ্ করত। দূর দূরান্তর থেকে বিদেশীরা আসত বাণিজ্য করতে ; জমিদাররাও আনন্দে প্রজা-শাসন করতেন।

সময় সময় এই সব জমিদারদের কেউ কেউ প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে উঠতেন, রাজশক্তিকে তুচ্ছ কবে নিজেরাই এক একজন এক একটি ছোটখাট রাজা হয়ে বসতেন। সৈন্যসামন্ত পুষতেন এবং, সুযোগ পেলে, পাশের জমিদারদের এলাকায় হানা দিয়ে তাঁদের জমিদারী খানিকটা দখল করে নিতেও ছাড়তেন না। জমিদারী, রাজত্ব আর সেই সঙ্গে ডাকাতি—তিনটে পেশাই চলত একসঙ্গে।

তারপর একদিন এল ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা, আর আসতে লাগল আরাকান অঞ্চল থেকে দলে দলে মগ,—তারাও জলদস্যু। সুন্দরবনই হ'ল তাদের শিকারের আড্ডা। জন্তু শিকার নয়—মানুষ শিকার। মানুষের ধন-সম্পদ—মান-মর্যাদা শিকার। তাদেরই অত্যাচারে কি করে সুন্দরবনের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি ছারখার হয়ে যেতে লাগল—প্রাণভয়ে ভীত প্রজারা দলে দলে দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল—সমৃদ্ধ জনপদ ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত শ্মশান হয়ে যেতে লাগল, সে ইতিহাস এখনও ভালো করে লেখা হয় নি। কিন্তু এখনও সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মাঝে মাঝে সেই সব সমৃদ্ধ জনপদের স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়। বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ—উঁচু উঁচু ঢিবি, কেল্লার গড় বা পরিখা ইত্যাদি কত কি !

কাজেই যে ভাঙ্গা বাড়িটার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সেটায় সত্যি আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু ইতিহাসের কথা থাক, আপাততঃ আমরা বরঞ্চ ঐ বাড়িটার চারদিকে একটু ঘুরে দেখি।

বাড়িটা অতি প্রাচীন। দেয়ালের পাতলা পাতলা ইটগুলি দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আজকালকার দিনে ওরকম পাতলা ইটের বড় একটা চলন নেই। শুধু পাতলাই নয়, কোন কোন ইট আবার বেশ কারুকার্য করা।

কিন্তু কারুকাজ হলে কি হবে, কালের নিষ্ঠুর আঘাতে জরার হাত থেকে তা রক্ষা পায় নি। অনেক জায়গায় ইট বেরিয়ে এসেছে, কোন কোন জায়গায় খসে পড়েছে একদম। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, জায়গায় জায়গায় যেন সম্প্রতি একটু-আধটু মেরামত করা হয়েছে। দরজা-জানালাগুলো সর্বত্র খাঁ-খাঁ করছে না, কোন কোনটা যে সম্প্রতি নাড়াচাড়া করা হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। তবে কি কেউ এ বাড়িটায় এসে এখন বাস করতে সুরু করেছে ?

ঠিক তাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই তা টের পাওয়া যাবে। সন্ধ্যার পর জানালার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেখা বেরিয়ে আসবে। তা হলে নিশ্চয়ই

এটাতে কোন মানুষ বাস করে ; বুনো জানোয়ারও নয়, কোন অশরীরীও নয়। কারণ বুনো জানোয়ারেরা নিশ্চয়ই আলো জ্বালাতে জানে না। আর অশরীরীদের তো আলোর কোন প্রয়োজনই নেই।

কিন্তু এখানে, এই জঙ্গলের মধ্যে বাস করতে আসবে এমন উদ্ভট শখ কার হতে পারে ? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, দেখাই যাক্ না।

ফটক পেরিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকলে দেখা যাবে সামনে লম্বা বারান্দা চলে গেছে—সারি সারি থাম দিয়ে গড়া বারান্দা। সেই বারান্দা শেষ হয়েছে একটা প্রশস্ত চাতালে। তার সামনে পাশাপাশি দু'টো ঘর। দু'টোই বেশ বড় বড়।

কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যাবে সেই ঘরে ঢুকলে। একটা ঘর একেবারে বই দিয়ে ঠাসা। নানান্ রকমের, নানান্ ভাষার বই। এই নির্জন জঙ্গলের রাজ্যে এত বই কি করে এল ? কে আনল ? পাশের ঘরটি আরও কৌতূহলজনক। সেখানে বই নেই, কিন্তু ঢুকলেই বোঝা যায় সেটি কোন ডাক্তারের ঘর। রোগী দেখবার এবং রোগীর ওপর অস্ত্রোপচার করবার জন্য নানা সরঞ্জামে ভর্তি সেই ঘর। তবে কি—তবে কি কোন ডাক্তার এসে এখানে, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ? কি তাঁর মতলব ? কোনও গভীর বিষয় নিয়ে গবেষণা, না কি লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অজ্ঞাতবাস ?

কিন্তু বেশিক্ষণ দ্বিধায় কাটাবার দরকার নেই। ঐ যে তিনি আসছেন। লম্বা সাদা কোট বাতাসে দুলছে। গাল ভরা লম্বা দাড়ি, তাও দুলছে সেই সঙ্গে। তবে—তবে কি ডক্টর দ্বিবেদী ? তিনি। তিনি এই অদ্ভুত পরিবেশে এসে গা-ঢাকা দিয়েছেন ?

সত্যিই ডক্টর দ্বিবেদী। সেই চেহারা। সেই পোষাক। তবে এই পাঁচ বছরে চুলটা যেন আর একটু পেকেছে, দাড়ি প্রায় সবটাই সাদা হয়ে এসেছে। তবু চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আজও তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটু পরেই আর একটি ছেলে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। ছেলেটি বয়সে তরুণ, মুখে সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সুন্দর, সুগঠিত দেহ। হাসিমুখে সে এসে ডাকল—"দাদু !"

ডক্টর দ্বিবেদী ফিরে তাকালেন। তাঁরও মুখে সস্নেহ হাসি।

"আজ পরীক্ষা নেবে না দাদু ?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" বলে ডক্টর দ্বিবেদী শেল্‌ফ্ থেকে একখানা বাঁধানো বই

টেনে বার করলেন। চকিতে একবার পাতা উল্টে বইখানা দেখে নিয়ে ছেলেটির হাতে সেটা তুলে দিলেন। ছেলেটি বইখানা তুলে নাকের কাছে ধরে খানিকক্ষণ কি দেখল, তারপর "হয়েছে" বলে হাসিমুখে দ্বিবেদীর হাতে সেটি ফেরৎ দিয়ে দিল। তারপর দ্বিবেদী ইশারা করতেই যেমন এসেছিল তেমনি আবার চলে গেল।

ছেলেটি চলে যাবার পরও ডক্টর দ্বিবেদী খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে শেল্ফ্‌গুলির দিকে এগিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ ভেবেচিন্তে উঁচুতে একটা তাকের ওপর কতকগুলি বই-এর পেছনে গুঁজে রাখলেন বইখানা।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ছেলেটি আবার ফিরে এল। ডাক্তার দ্বিবেদী আবার তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। ছেলেটি সামনে এগিয়ে এল, তারপর একবার চোখ বুজে যেন নাক ভরে নিঃশ্বাস নিল, তারপরই এগিয়ে গেল শেল্‌ফের দিকে। প্রত্যেকটি তাকের খুব কাছে মুখ নিয়ে চোখ বুজে বুজেই সে এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন পেয়ে গেছে এমনি ভাবে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে তাকের পিছন দিক্ থেকে বইখানা টেনে বার করল সে, এবং বিজয়ীর ভঙ্গিতে ডাক্তার দ্বিবেদীর হাতে তুলে দিয়ে তেমনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ডাক্তার দ্বিবেদীও সে হাসি ফিরিয়ে দিয়ে তার পিঠে মৃদু একটা চাপড় মেরে বললেন, "সাবাস্"।

"উঁহুঃ, শুধু সাবাসে হবে না, বখশিস !"

ডাক্তার দ্বিবেদী তাঁর লম্বা ঝোলা কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তারপর, কে জানে কোন্ চোরাপকেট থেকে, টেনে বার করলেন এক টুকরো চিউইংগাম্। ডাক্তার দ্বিবেদী পান খান না, তামাক বা চুরুট বা সিগারেটের নেশাও নেই তাঁর, কিন্তু চিউইংগাম্ তাঁর ভারি প্রিয়। ছাত্রাবস্থায় ইংল্যাণ্ডে থাকতে এই বদ্-অভ্যাস তিনি আয়ত্ত করেন এবং এখনও, এই বুড়ো বয়সেও, তা ছাড়তে পারেন নি। কাজ করার সময় মুখে একটা চিউইংগাম্ তাঁর থাকা চাই-ই। এবং ফলে ও জিনিসটা সর্বদাই তাঁর পকেটে পকেটে ঘোরে। জানি না দাঁত পড়ে গেলে কি করবেন !

গুরুর কাছ থেকে শিষ্যও দেখা যাচ্ছে অভ্যাসটি আয়ত্ত করেছে।

চিউইংগাম বার করার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের বারান্দা থেকে আর একটি ছেলে ছুটে এল। এ ছেলেটিও প্রথম ছেলেটিরই প্রায় সমবয়সী, তবে চেহারাটা একটু বেশি কালো। ডাক্তার দ্বিবেদীর দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, "আর আমারটা ?"

ছেলেটি বেশ বাংলা বলে, কিন্তু আসলে সে যে বাঙালী নয় তা তার কথার টানে বোঝা যায়।

ডাক্তার দ্বিবেদী খুশি হয়ে বললেন, "কানে গেছে তা হলে?" বলে হেসে তার হাতে একটা সেই মহামূল্য চর্ব্য পদার্থ গুঁজে দিলেন। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তা মুখে পুরে দিয়ে মনের আনন্দ প্রকাশ করল, এবার ইংরেজীতে—"ছাট্‌স্‌ ভেড়ী গুড্ড।"

অপর ছেলেটি জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে অর্ধচর্বিত চিউইংগামটি একদিকে ঠেলে দিয়ে বলল, "খাসা ইংরেজী তোর রঙ্গনাথন্‌!"

রঙ্গনাথন্‌ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল,—"আর তোমাড়ো উচ্চাড়ণ—পিকুলিয়ড়ো! তাই না দাদু?"

রঙ্গনাথন্‌ নাম শুনে ছেলে দু'টি কে, হয়তো আন্দাজ করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এরাই সেই নিরুদ্দেশ দু'টি ছেলে—অনুতোষ আর রঙ্গনাথন্‌। এত জায়গা থাকতে এরা শেষে এই সুন্দরবনের নির্জন প্রান্তে কি করে এল আর ডাক্তার দ্বিবেদীর সঙ্গেই বা তাদের ঐ সম্পর্ক কি করে হ'ল সবই যেন রহস্য মনে হচ্ছে।

—সাত—

সন্ধ্যার পর তিনজনে খেতে বসেছেন। এই সময়টা ডাক্তার দ্বিবেদীর গল্প বলার সময়। খেতে খেতে নানান্‌ গল্প চলে—কোথা দিয়ে ঘণ্টা কেটে যায় টেরও পাওয়া যায় না। শুধু খোশগল্প নয়, ডাক্তার দ্বিবেদী এই সময় আরও নানা বিষয়ে গল্পচ্ছলে আলোচনা করেন—যার ফলে অনুতোষ এবং রঙ্গনাথন্‌ দু'জনেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছে।

একটা গরম মাছভাজা মুখে পুরে দিয়ে অনুতোষ আরামে চোখ বুঁজে চিবুচ্ছিল, হঠাৎ রঙ্গনাথন্‌ ইশারায় তাকে থামতে বলে কান পেতে কী যেন শুনবার চেষ্টা করতে লাগল।

ডাক্তার দ্বিবেদী সপ্রশ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল?"

অনুতোষই জবাব দিল। "কি আবার হবে, ও তো সব সময়েই কিছু না কিছু শুনছে। এক মুহূর্ত স্বস্তি নেই। যেমন শিখিয়েছ, ভোগো এখন।"

রঙ্গনাথন্‌ আবার হাতের ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিল। মিনিট খানেক খাওয়া বন্ধ রেখে যেন গম্ভীর হয়ে রইল, তারপর বলল, "কেমন যেন একটা ছপ্‌

ছপ্ আওয়াজ। নৌকোর দাঁড় ফেললে যে রকম আওয়াজ হয়। তবে মনে হচ্ছে অনেক দূরে।"

"নদীতে বান ডেকেছে হয় তো।" বলল অনুতোষ—"ঢেউগুলো এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে জোরে জোরে, তাই হয় তো ঐ রকম মনে হচ্ছে।"

রঙ্গনাথন্ আরও খানিকক্ষণ কান পেতে শুনল, তারপর বলল, "উঁহুঃ, নদীর পাড় তো অনেক কাছে। এ ছপ্ ছপ্ আরও দূরের। নিশ্চয়ই নদী দিয়ে কোন নৌকো আসছে।"

ডক্টর দ্বিবেদী যেন একটু চিন্তিত হলেন। এ অঞ্চলে লোকজনের যাতায়াত খুব কম। প্রায় মাইল দশেক দূরে সুবলচকে কিছু লোক থাকে। জঙ্গলের মধু আরও এটা-সেটার ব্যবসা করে তারা। সেখানেই সপ্তাহে একদিন করে ছোটখাট একটা হাট বসে। ওঁরাও তাঁদের সপ্তাহের প্রয়োজনীয় রসদ সাধারণতঃ সেখান থেকেই সংগ্রহ করে আনেন। এ ছাড়া বাইরের লোক এ অঞ্চলে কালেভদ্রে ছাড়া কখনও আসে না। কাজেই, রঙ্গনাথনের অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে একটু আশ্চর্যের কথা বৈকি!

সেদিন আর গল্প তেমন জমল না। খাওয়াদাওয়ার পর ডক্টর দ্বিবেদী তাঁর অভ্যাস মত লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। অনুতোষ আর রঙ্গনাথন্ও তাদের নিজের নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল। খিল দেওয়াটা এখানে হয় তো অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু তবু ওরা দেয়—বহুদিনের অভ্যাস ওটা। ঘরে খিল দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু একটা করে, কিন্তু কি করে বাইরের লোকের তা জানা সম্ভব নয়।

পরদিনই সুবলচকের হাট-বার। আজকাল রঙ্গনাথন্ আর অনুতোষ পালা করে এক একজন এক এক সপ্তাহে হাটে যায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতে। খুব ভোরে উঠেই রওনা হতে হয়, নইলে সময় মতন হাট মেলে না। এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব আছে, অন্য বন্য জন্তুও কম নেই; তাই ব্যাপারীরা বিকেলের অনেক আগেই হাট তুলে দিয়ে যে যার আস্তানায় ফিরে যায়। কাজেই হাট সকালের দিকেই জমে ভালো।

আজ রঙ্গনাথনের পালা ছিল। কিন্তু ডাক্তার দ্বিবেদী বললেন, "না হে, আজ আর একা যেও না। দু'জনে একসঙ্গে যাও বরঞ্চ। কি জানি কিছু একটা ঘটলে—"

"আর তুমি যে একা থাকবে। বিশ্বনাথটা থাকলে না হয় তবু হ'ত।"

বিশ্বনাথ ওদের ওখানে কাজ করছিল। বেশ বিশ্বাসী। এ অঞ্চলেরই লোক। দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। দিন দশেক পরে আসবে বলে গেছে, কিন্তু এখনও ফেরে নি। অবশ্য ফিরবার সময়ও হয় নি।

ডাক্তার দ্বিবেদী হেসে বললেন, "আমার ওপর আর কে হামলা করবে, আমাকে ধরে পাবেই বা কি? বাঘে ধরলে রুঠো মাংস দেখে ফেলে দেবে, ডাকাতে ধরলেও কিছু হীরে-জহরৎ পাবার আশা নেই তাদের। একটা দাড়িওয়ালা চামড়া-কোঁচকানো মুণ্ডু কেটে নিয়েই বা কি করবে তারা? ডাকাতে কালীরও ও জিনিস পছন্দ হবে না নিশ্চয়।"

"কী যে বল দাদু! আচ্ছা, তা হ'লে দু'জনেই যাই। ফিরতে কিন্তু সেই বেলা কাবার হয়ে যাবে। হাট শেষ করে আর একটু এগিয়ে দোলাই সর্দারের কাছেও একবার যাব। যদি ভালো মধু পাই তাও নিয়ে আসব কিছুটা।" বলে অনুতোষ রঙ্গনাথনের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল।

ডাক্তার দ্বিবেদী ধীরে ধীরে বাগানের দিকে এগিয়ে গেলেন। অনেক যত্ন করে তিনি বিশ্বনাথের সাহায্যে এই বাগানটি তৈরি করে তুলেছেন। নানা রকম দুষ্প্রাপ্য গাছ, যা বিশেষ করে এ অঞ্চলে ছাড়া দেখা যায় না, খুঁজেপেতে এনে লাগিয়েছেন। কাঁটাওয়ালা বুনো ঘাস, বেগুনী রং-এর জবা, গাঢ় নীল স্থলপদ্ম, লাল অগ্নীশ্বর কলা, পঞ্চমুখী তাল, সাদা ডাব—আরও কত কি! সব গাছে এখনও ফলন হয় নি, কিন্তু গাছ যে রকম সতেজে বেড়ে উঠছে তাতে আশা করা যায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফলন হবে। নানা রকম কবিরাজী গাছ-গাছড়াও বাদ যায় নি। হিমকর্পূর, নিম্বলবঙ্গ, মহাভৃঙ্গক্রম, সূচীশলাকা, বন-উডুম্বর, চিদাম্বুলি—আরও কত সব! নাম করতে গেলে মনেও থাকে না—বই খুলে খুলে বলতে হয়।

একটা মস্ত বড় গাছের চারপাশে লাঠির মত মেলাই কি পুঁতে রাখা হয়েছে। গাছটা জলের ধারে হেলে আছে, আর লাঠিগুলো খুঁটির মতো তাকে ঘিরে রয়েছে কাদার ভেতর। এখানে একটা গাছকে ঘিরে এমন খুঁটি পুঁতবার কারণ কি? আসলে ওগুলো খুঁটিই নয়,—ঐ গাছের শিকড়। নিঃশ্বাস নেবার জন্য আমাদের মত গাছেরও খানিকটা বাতাস টেনে নেওয়া দরকার। এ গাছগুলো ঐ খুঁটি বা লাঠির মত খাড়া করা শিকড় দিয়েই সে কাজ চালায়। খুব চালাক গাছ বলতে হবে! এই ধরনের শিকড়কে ইংরেজীতে বলা হয় 'ব্রীদিং রুট্'। সাধারণতঃ লোনা জলের কাছাকাছি ডাঙায় এ-সব গাছ জন্মায়। সুন্দরবনে এদের সংখ্যা প্রচুর।

ডাক্তার দ্বিবেদী একটা গাছ ভালো করে দেখবার জন্য একটা ঝোপের দিকে যেই এগিয়েছেন, এমন সময় চার-পাঁচজন জোয়ান জোয়ান লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। একজন একটা মোটা বাঁশ তুলে ধরে বলল, "সেলাম ডাক্তার সাব্, সর্দার আপনার সঙ্গে ভেট মাংগ্ছেন।"

"সর্দার! কে সর্দার? কোন্ সর্দার?"

লোকটা বিনয়ে গদ্গদ হয়ে বললে, "এরই মধ্যে ভুলিয়ে গেলেন ডাক্তার সাব্! ভুল্লু সর্দার। এবার মালুম হচ্ছে? সেই যাকে পান পান—দস হাজার রূপেয়া খিলাইয়েছিলেন? সেই ভুল্লু। আপনার সাথ মুলাকাৎ করনে আয়া।"

"আমার কাছে? আভি ক্যা কাম হ্যায়?"

"সে আমি কুছু বলতে পারবে না, সর্দারজীসে পুছিয়ে। চলিয়ে।" বলে সে ইশারা করে ডাক্তার দ্বিবেদীকে এগোবার জন্য নির্দেশ দিল।

ডাক্তার দ্বিবেদী উপায়ান্তর না দেখে ওদের সঙ্গে সঙ্গে জলের ধারে চলে এলেন। সত্যি, একটা বড় নৌকো নোঙ্গর করা আছে জলের ধারে। বেশ বড় নৌকো—ছোটখাট একখানা বজরার মতন। আর তারই পাটাতনের ওপর মোড়া পেতে বসে আছে এক বিশালকায় দানবাকৃতি লোক। পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা ডোরাকাটা গেঞ্জী। গলা থেকে একটা মস্ত বড় চৌকো পদক গেঞ্জীর ওপরেই বুকের মাঝখানটায় ঝুলছে। মাথায় একটা চেক-কাটা কাপড় পাগড়ীর মত ফেট্টা দিয়ে বাঁধা। এই যে দলের সর্দার ভুল্লু তা এক লহমায় চিনে নেওয়া যায়।

ডাক্তার দ্বিবেদীকে দেখে ভুল্লু আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে নেমে এল। আভূমি সেলাম করে বলল, "এই যে ডক্টর সাব্, সোব খোবোর ভালো তো?"

ডাক্তার দ্বিবেদী বিরক্তি এবং কৌতূহল কোন রকমে চেপে বললেন, "হুঁ, ভালোই। তা তুমি এদিকে কি করতে?"

"এই যাচ্ছিলাম একটু বেড়াইতে, মনে হ'ল ডক্টর সাব তো এহিখানেই আছে, একটু দেখা-টেখা করে যাই। কুচ্ছু রূপেয়ার ভি দোরকার ছিল, লিয়ে লেব।"

ডাক্তার দ্বিবেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন ভুল্লু সর্দারের দিকে। ভুল্লু কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না, বলল, "দরিয়ার উপর বসিয়ে বসিয়ে কি কোথা হোয়, ডক্টর সাব্? চলুন, আপনার ডেরায় চলুন।" বলেই একজন সঙ্গীকে ডেকে বলল, "এই মংলু! চল্, ডক্টর সাব্কে কোঠি লিয়ে চল্।"

মংলু অনুগত সেবকের মতন এগিয়ে এসে বলল, "চলিয়ে ডক্টর সাব্!"

ডাক্তার দ্বিবেদী লক্ষ করলেন, শুধু মংলু নয়, তাদের দলের আর ৫।৭ জন

গাট্টাগোট্টা জোয়ান আবার তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অগত্যা বিনা প্রতিবাদে তিনি ধীরে ধীরে নিজের আস্তানার দিকে ফিরে চললেন।

চলতে চলতে ভুল্লু প্রশ্ন করল, "ক' সাল হোবে ডক্টর সাব্? পান-ছে-সাত? আপনি উস্তাদ্ লোক।"

ডাক্তার দ্বিবেদী কোন রকমে হুঁ-হুঁ। করতে করতে তাঁর আস্তানা—সেই ভাঙা বাড়িটার মধ্যে এসে ঢুকলেন। ভুল্লু তেমনি বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আরে, ব্বাপ্, ডক্টর সাব্কো আগারি যেতে দে। আসুন ডক্টর সাব্, আমরা ভিতর গিয়ে বসি, এ সোব কোথাবাত্রা কি বাইরে হোয়?"

ডাক্তার দ্বিবেদী লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ভুল্লুও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল। চারদিক্ তাকিয়ে বল্ল, "শুধু কিতাব! কিতাব দিয়ে হামার কী হোবে? কুছু রুপেয়া দিজিয়ে। দস্ বিস হাজার।"

ডাক্তার দ্বিবেদী হতবুদ্ধির মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন।

ভুল্লু আবার আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বলল, "ভোরছেন কেনো? পান-সাত-দস হাজার রুপেয়া তো আপনার হাথের মোয়লা। লাখো লাখো রুপেয়া কামাচ্ছেন। হীরা-জহরৎ ভি জরুর হুয়া বহুৎ! কুথা লুকিয়ে রেখেছেন সোব? ছেলিয়া দুঠো কাঁহা গেলো?"

এতক্ষণে ডাক্তার দ্বিবেদী কথা বলবার মতন জোর পেলেন, বললেন, "টাকা কোথায় পাব? আমি তো রোজগারের জন্য এখানে আসি নি! টাকা তো দেশে বসেই রোজগার হ'ত।"

অবিশ্বাসের হাসিতে মুখ কুঞ্চিত করে ভুল্লু বলল, "ও সোব কোথা দুসরা লোককে বলবেন; হামাকে না। দো-দোঠো লড়কেকে ভাগিয়ে আনবার জন্য পান পান দস হাজার রুপেয়া আপনি নিজে হামাকে দিয়েছেন, হামি গিনে গিনে লিয়েছি। দস্ হাজার খর্চা কোরেছেন, কোতো হাজার কামিয়েছেন! না তো পান বংষ কোই এহি জঙ্গলমে গায়ে ঢাকা দিয়ে থাকে? ছেলিয়া দোঠো বোড়ো হয়ে গেছে, তাদের শিখলিয়েছেন, তারাই তো এখন কামিয়ে আনছে। কুথায় গেলো তারা? তাদের ভি হামি দেখতে চাই।"

—আট—

ডাক্তার দ্বিবেদী থতমত খেয়ে বললেন, "তারা কেউ এখানে নেই। থাকেও না। আর তা ছাড়া তাদের দিয়ে টাকা কামাবার জন্যও তাদের আনি নি। তারা টাকা কামায়ও না।"

ভুল্লুর দন্তপংক্তি আবার ফাঁক হ'ল। বলল, "আপনি হাঁসালেন ডাক্তার সাব্। আপনার কোথা স্থনে হামার হাঁসি আসছে। বড়া বড়া ঘর থেকে গুণ্ডা লাগাইয়ে দো দোঠো ছোঁড়াকে আপনি ভুলাইয়ে নিয়ে এলেন। মোৎলোব কী ছিল আপনার আমরা, গুণ্ডা লোক, আমরা বুঝি না? তব্ হঁা' ঝুট বলবো না, আপনার দাওয়াই ভি বহুৎ বঢ়িয়া ছিল। বংগালী ছেলিয়াটা তো একদম টের ভি পেল না। স্রেফ চলিয়ে এল। আর ঐ ছেলেটা থোড়া গোলমাল লাগিয়েছিল, কিন্তু ভুল্লু সর্দার যে কাজের ভার নেয় তা বরবাদ করে না। আপনার রূপৈয়া খেয়েছিলাম, কাম ভি হাসিল করে দিয়েছি। দু'টো ছেলিয়া লিয়ে আপনি চুপসে পলাইয়ে এসেছেন এই জঙ্গলমে। সোব হামরা জানি। তা কি কিসিকে বলেছি? নাকি ছেলিয়ার বাবার কাছে ডবল রূপৈয়া মেঙ্গে আপনাকে ধবিয়ে দিয়েছি? ভুল্লু সর্দার গুণ্ডা আছে, লেকিন বেইমান নয়।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "লেকিন ডক্টর সাব্, ওর ভি তো কুছ দেনা চাহি। এক আদমী বেধড়ক মুনাফা লুটবে ওর উস্‌কো সাগরেদ বসিয়ে বসিয়ে দেখবে ইয়ো তো ঠিক বাৎ নেহি।"

ডক্টর দ্বিবেদী এবার যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, যে কারণেই হোক, দু'টি চালাকচতুর ছেলের প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর, এবং বেশ কয়েক বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, ছেলে দু'টি সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে থাকা দরকার। তাঁর ইচ্ছেমত করে তিনি তাদের গড়ে তুলবেন। কিন্তু ও রকম শর্তে কোথায় পাবেন ছেলে? কে ছেড়ে দিতে রাজী হবে নিজের ছেলেকে ও-ভাবে? সেই জন্যেই, উপায়ান্তর না দেখে, মরিয়া হয়ে তিনি ভুল্লু সর্দারের সাহায্য নিয়েছিলেন। ছেলে 'কিড্‌ন্যাপ্' করতে অর্থাৎ চুরি করতে ভুল্লু সর্দার ওস্তাদ্, এ খবর তিনি সংগ্রহ করেছিলেন আগেই—যখন ঐ দলের একজন হাসপাতালে দৈবক্রমে তাঁর চিকিৎসাধীনে এসে পড়ে। সেই লোকটাই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল। এবং ছেলে প্রতি পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে ভুল্লু সর্দার কাজ উদ্ধার করে দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অবশ্য ডাক্তার দ্বিবেদীও সাহায্য করেছিলেন—ছেলেদের ধরে আনবার আগে অচেতন করে নেবার জন্য ওষুধ যুগিয়ে। ভুল্লু সর্দার অবশ্য তার কাজ ঠিকমতই করেছিল এবং তিনিও তার পারিশ্রমিক কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং সে দেনাপাওনা চুকেবুকে গেছে। এখন আবার তার জের টানা কেন? ভুল্লু সর্দারকে তিনি বিশ্বাসও করেছিলেন, সে তাঁকে কোনদিন ফাঁসিয়ে দেবে না।

সে দিক্ দিয়েও ভুল্লু কোন বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। সেজন্য তিনি কৃতজ্ঞ। ছেলে দু'টিকে তিনি কি ভাবে মানুষ করছেন তার জবাব ভুল্লুকে কেন দিতে হবে?

ভুল্লু জবাবে বলল, সে জন্য সে আসে নি। ছেলে দু'টোকে তিনি যে ভাবেই ব্যবহার করুন না তাতে কি এসে যায়? তবে কিন', সে খবর পেয়েছে ছেলে দু'টির দাম এখন বহুৎ মাঙ্গা হয়ে গেছে। ওরা অনেক কিছু করতে পারে এবং ডক্টর সাব্ তার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন। নিশ্চয়ই তিনি তা হ'লে এতদিনে ক্রোড়পতি হয়ে গেছেন। নইলে, পয়সা কামানো ছাড়া, কোন সুস্থ লোকে যে অন্য কোন কারণে সময় নষ্ট করতে পারে ভুল্লু সর্দার তার এতদিনের অভিজ্ঞতার পর তা বিশোয়াস করতে রাজী নয়; সুতরাং প্রথমে যখন সে-ই সাহায্য দিয়েছিল তখন তার আরও কিছু লভ্য নিশ্চয় হয়েছে। সরকারও তো বাড়তি মুনাফার জন্যে এক্‌সেস্ প্রফিট্ ট্যাক্স আদায় করেন। এটাকেও সেই ভাবেই দেখুন না!

কথা কাটাকাটি চলল কিছুক্ষণ। ডাক্তার দ্বিবেদী নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এখানে হীরে-জহরৎ তো দূরের কথা, নেহাৎ খরচ চালানোর বেশি সামান্য উদ্বৃত্ত টাকাও নেই। সঙ্গে যা এনেছিলেন তা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এখন খরচ চলবে কি করে সেই ভাবনাও দেখা দিয়েছে। সুতরাং ভুল্লু সর্দার আগাগোড়াই ভুল ধারণা করে এসেছে।

"তব্ ছেলিয়া দোঠোকে বাহার করিয়ে দেন; হামার হিস্‌সা হামি উদের থেকে লিয়ে লিব।"

"কোথায় পাবে ওদের? ওরা তো এখানে নেই!"

ভুল্লুর বিরাট পাকানো গোঁফের পাশে এবারে একটা মুচকি হাসি খেলে গেল। আর সময় নষ্ট না করে সে সঙ্গীদের ইঙ্গিত করল, আর সংক্ষেপে বলল, "তব্ চলিয়ে ডক্টর সাব্!"

মানুষকে কি করে ধরে নিয়ে যেতে হয় সে ব্যাপারে এদের দক্ষতা অপরিসীম। মুহূর্তের জন্য ডাক্তার দ্বিবেদী অনুভব করলেন কে যেন সজোরে তাঁর নাকে একটা তীব্র ওষুধ-মাখানো রুমাল চেপে ধরেছে আর দু'তিনজন মিলে তাঁর হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধবার উদ্যোগ করছে। বৃদ্ধ ক্ষীণভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার আগেই তাঁর অসাড় দেহ চেয়ারের উপর ঝুলে পড়ল।

ভুল্লুর দল আর দেরী করল না। চট্‌পট্ কাজ করে ডাক্তার দ্বিবেদীকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল নৌকোর দিকে।

একটু পরেই জলের ধারের নৌকোখানা ছুপ্ ছুপ্ করতে করতে দাঁড় ফেলে আবার জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলল।

অমুতোষ আর রঙ্গনাথন্ হাটে সওদা করে দোলাই সর্দারের আড্ডায় হাজির হ'ল। দোলাই সর্দার মধুর ব্যবসা করে। সুন্দরবনের মধু নামকরা। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে সে সেই মধু সংগ্রহ করে রাখে, তারপর পাইকাররা এলে সুবিধামত দরে ছেড়ে দেয়। দোলাই সর্দারের মধুর নাম আছে পাইকারদের কাছে।

অমুতোষ আর রঙ্গনাথন্ হাটের সওদা শেষ করে যখন দোলাই সর্দারের ঘরে গেল তখন বেলা একপ্রহর পার হয়ে গেছে। সর্দার ঘরে ছিল না, তার বৌ উঠোনে চাটাই পেতে চুল শুকোচ্ছিল। সর্দার কোথায় জিজ্ঞেস করতে বললে, "ঘরকে নেই, বনকে গেছে, মধু পাড়তি।"

"কোথায়? কোন্ বনে?"

"তা কী করে কইব! সোন্দরতলীও হতি পারে, গুড়নিবাড়িও হতি পারে, আবার নিমছত্তরও হতি পারে। তিনটে তিনদিকে।"

ভালো বিপদ্! এখন কি করা যায়? খালি হাতেই কি ফিরতে হবে তা হ'লে?

হঠাৎ রঙ্গনাথন্ বাধা দিয়ে বল্‌ল, "না, খুব বেশি দূর যায় নি। ঐ শোন্ টপ্ টপ্ আওয়াজ। নিশ্চয় মধু পড়ছে হাঁড়িতে। চল্, খুঁজে দেখি।"

"সত্যি বলছিস?"—বিস্মিত আনন্দে অমুতোষ প্রশ্ন করল।

"তা নয় হ'ল। কিন্তু কোন্‌দিক্ পানে যাবা।" সর্দার-গিন্নী মন্তব্য করল।

"সে ঠিক করে নেব। তুমি বরঞ্চ একটা হাঁড়ি দাও আর সর্দারের গামছাটা। গামছাও নিয়ে গেছে নাকি?"

"দেখি ঘরের মধ্যি আছে নাকি!" সর্দারের বৌ উঠে গেল। অমুতোষ বলল, "সর্দারের গামছাটাই এনো কিন্তু, অপর কারুর নয়।"

গামছা নিয়ে সর্দার-গিন্নী অমুতোষের হাতে দিতেই অমুতোষ বারকয়েক সেটা নাকের কাছে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করল, তারপর ফের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, "সর্দারের গামছা ঠিক তো?"

সর্দার-গিন্নী এবার ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, "ছোঁড়ার কথার ঢং দেখ না! হ্যাঁ-গো, হ্যাঁ। মিথ্যি বলব ক্যানে? এই তো সর্দার মাথায় এটা ফেট্টি বেঁধে ঘুরছিল, এখনও চুলের ভাঁজ লেগে রয়েছে। ভার বইতি হবে তাই বড় গামছাটা নে গেছে"

অনুতোষ আর বাক্যব্যয় করল না। গামছা দিয়ে হাঁড়িটা বেঁধে রঙ্গনাথন্‌কে পেছনে পেছনে আসবার নির্দেশ দিয়ে অম্লানবদনে এগিয়ে চলল বনের ভিতর দিয়ে।

বনের মধ্যে পায়ে-চলা পথ, এঁকেবেঁকে চলে গেছে কোথায় কে জানে! অনুতোষ কিন্তু নির্ভাবনায় চলছে। মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক্ ফিরে নাক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আবার এগিয়ে চলছে।

খানিকক্ষণ বাদে তারা একটা উঁচু জায়গায় এসে পড়ল। মানে মাঝখানটা উঁচু—চারদিকে ঢালু হয়ে গেছে, আর সেই ঢালু জায়গা জুড়ে কতকগুলি শাল পিয়াল আর সুন্দরী গাছ জায়গাটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তারপর দূরে, তারই একটা গাছের নীচে দোলাই সর্দারকে সত্যি দেখা গেল। পাঁচ-সাতটা হাঁড়ি সে ইতিমধ্যেই টাটকা মধুতে ভরে ফেলেছে, আর একটা প্রায় ভর্তি হয় হয়। গাছের ওপর পাশাপাশি মস্ত দু'টো মৌচাক। একটা থেকে তখনও বিন্দু বিন্দু মধু ঝরে পড়ছে নীচে।

এরা পুরোনো খরিদ্দার, সর্দার দু'জনকেই চেনে। হেসে বলল, "সাবাস্, এখানে এই জঙ্গলেও খুঁজে খুঁজে এসেছ বাবুরা!"

"হ্যাঁ, আমাদের যে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। দাও মধু দাও! একেবারে টাটকাটাই দিও কিন্তু।"

"সব টাটকা। দোলাই সর্দার টাটকা ছাড়া কাজ করে না। করলে আর এই বিভূঁই জঙ্গলে পড়ে থাকত না। নাও, কতটা নেবে। হাঁড়ি এনেছ? ও, এযে আমারই হাঁড়ি দেখছি!"

"শুধু তোমার হাঁড়িই নয়, গামছাটাও তোমারই। চিনতে পাচ্ছ না? ওটা অবিশ্যি তোমায় ফেরৎ দিয়ে যাব। গামছা দিয়ে হাঁড়িটা বেঁধে আনতে সুবিধা হ'ল কিনা! তা ছাড়া —" অনুতোষ কথাটা শেষ না করে রঙ্গনাথনের দিকে মিট্‌মিট্ করে হেসে তাকাল। রঙ্গনাথন্‌ও হেসে বলল, "হ্যাঁ, ইনঅ্যানিমেট্ গাইড্।"

সেদিন অনুতোষ আর রঙ্গনাথনের আস্তানায় ফিরতে দিন প্রায় কাবার হয়ে এল। ভেবেছিল, ঢুকেই দেখবে দাদু চায়ের টিপয়টি বাইরের বারান্দায় এনে সমস্ত সরঞ্জাম সাজিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু কোথায় দাদু! এ ঘর ও-ঘর খুঁজেও তাঁর কোন হদিস পাওয়া গেল না। "দাদু! দাদু—উ!" চীৎকার করে দু'জনেই ডাকতে লাগল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অন্য সময় বিশ্বনাথ থাকে, কিন্তু আজ আর বাড়িতে দ্বিতীয় লোকও নেই। ব্যস্ত হয়ে দু'জনে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল। দেখা গেল ডাক্তার দ্বিবেদীর চেয়ারখানা উল্টে পড়ে আছে। কিছু জিনিসপত্রও এদিক্ ওদিক্ ছড়ানো। কিছু আগে যে এখানে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে গেছে তার চিহ্ন রয়েছে।

একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল দু'জনেই। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল বাগানে, কারণ এ বাগানটি দাদুর খুবই প্রিয়, রোজ একবার করে তাঁর এখানে আসা চাই-ই। বাগানে ডাক্তার দ্বিবেদীর চটির দাগ রয়েছে এবং সে দাগ ধীরে ধীরে চলে গেছে জলের ধারে। কিন্তু সেখানেই যত গোলমাল! এক জায়গায় ভিজে মাটিতে অনেকগুলি পায়ের ছাপ—তার কতকগুলি আবার খালি পায়ের, কিন্তু বেশ ভারী পায়ের পাতা আর আকারেও বেশ বড়। পাগুলি যে কোন জোয়ান লোকের তা দেখলেই বোঝা যায়।

—নয়—

রঙ্গনাথন্ জলের ধার দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। আকাশের আলো তখন অনেকটা কমে গেছে; তবু, সেই অস্পষ্ট আলোকেই দেখা গেল, এবারে ঐ খালি পায়ের ছাপগুলি বেশ সুসংবদ্ধ। যেন সার বেঁধে কারা জলের ধারে এসেছে। একজন না, কয়েকজন। কতকগুলি ছাপ আবার উল্টো দিকেও রয়েছে; কিন্তু সেগুলো অস্পষ্ট, কতক জলের তোড়ে ধুয়েও গেছে। যেগুলো জলের দিকে গেছে সেগুলো আরও স্পষ্ট। এ থেকে সহজেই অনুমান হয় কেউ জল থেকে উঠে আগে বাড়ির দিকে গিয়েছিল, তারপর আবার ফিরে এসেছে। বাড়ির দিকে যাবার দাগগুলির মধ্যে যেন চটির দাগটাও দেখা যাচ্ছে; কিন্তু উল্টো দিকে, অর্থাৎ জলের দিকে যাবার দাগগুলিতে সে রকম চোখে পড়ল না। অর্থাৎ হয় ডাক্তার দ্বিবেদী ঐ দলে ছিলেন না, কিংবা তাঁকে কেউ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেছে, মাটিতে নামতে দেয় নি। যদি শেষেরটা সত্যি হয় তবে নিশ্চয় তিনি কোন বিপদে পড়েছেন—নইলে ওভাবে তাঁকে মাটিতে না হাঁটতে দিয়ে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবে কেন? তা ছাড়া অতগুলো লোক—সবাই জলের মধ্যেই মিলিয়ে যায় নি নিশ্চয়ই। নিশ্চয় তারা নৌকো নিয়ে এসেছিল এবং তাতেই দাদুকে তুলে নিয়ে গেছে।

রঙ্গনাথনের মনে পড়ল কালকের রাতের সেই দূর থেকে শোনা ছপ্ ছপ্ আওয়াজ। নিশ্চয়ই দাঁড় ফেলার শব্দ। তখন কেউ ব্যাপারটায় তত গুরুত্ব দেয় নি, কিন্তু হয়তো নৌকোটাই যত সর্বনাশের কারণ।

কতক্ষণ আগে ব্যাপারটা ঘটেছে? পায়ের ছাপ যখন রয়ে গেছে তখন বোঝা যাচ্ছে জোয়ারের জল চলে যাবার পরেই ঘটেছে, নইলে ও দাগ ভেসে চলে যেত। তার মানে ৫।৬ ঘণ্টার বেশি আগে নয়। নৌকাটাও যে কোন আধুনিক মোটর-বোট বা স্টীম্ লঞ্চ নয় তা তার দাঁড় ফেলা থেকেই আন্দাজ করা যায়। কলের নৌকো তো আর কেউ দাঁড় ফেলে চালায় না! রঙ্গনাথনের মনে পড়ল, দাঁড়ের শব্দ শুনে তার মনে হয়েছিল একসঙ্গে কয়েকখানা করে দাঁড় পড়েছে—আওয়াজ ছিল সেই রকম। তাই যদি হয় তবে নৌকোটা হয়তো আকারে বড়ই হবে। দ্রুতগামী ছিপের আজকালকার দিনে বড় একটা চলন নেই, সুতরাং হয়তো নৌকোটা বজরা গোছের কিছু একটা হবে। তা ছাড়া, মনে হচ্ছে, লোকসংখ্যাও ওতে নেহাৎ মন্দ ছিল না—সুতরাং বড়-সড় নৌকোই হবার কথা।

দু'জনে যুক্তিতর্ক দিয়ে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে চলল। বড় নৌকো খুব জোরে যেতে পারে না। এ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ওখানকার নদীনালা ওদের প্রায় সব মুখস্থ হয়ে গেছে। কোনও নৌকোকে বেরিয়ে যেতে হলে সেই সুবলচকের খাল দিয়েই বেরোতে হবে—বড় দরিয়ায় গিয়ে পড়তে অন্তত ৮।১০ ঘণ্টা লাগবে। সুতরাং ওরা যদি এখনই ওদের ছোট দ্রুতগামী ডিঙিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তা হ'লে বড় দরিয়ায় পড়বার আগেই হয়তো ওদের নাগাল পাওয়া যেতে পারে। এ ডিঙির গতিবেগ সাধারণ বজরার ৩।৪ গুণ তো বটেই। অবশ্য যদি বড় দরিয়ার দিকে না গিয়ে আর কোথাও ওরা আত্মগোপন করে থাকে তবে কিছু করবার নেই। কিন্তু তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

দ্রুতবেগে কিছু সাজসরঞ্জাম টেনে নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। অমুতোষ ডাক্তার দ্বিবেদীর লং-কোটটাও কাঁধে তুলে নিল। "ওটা দিয়ে কি হবে?" প্রশ্ন করল রঙ্গনাথন্। "দরকার আছে।" সংক্ষেপে উত্তর দিল অমুতোষ।

একটু পরেই একখানি ছোট ডিঙি সোঁ সোঁ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলল সুবল-চকের খালের দিকে।

রাত তখন গভীর। ডিঙি বাইতে বাইতে দু'জনেরই হাত ধরে এসেছে, কিন্তু তবু টানার বিরাম নেই। দু'জনেরই মন উদ্বেগে ব্যাকুল।

দূরে একটা উঁচু চূড়ার মত কি দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারেও চিনতে কষ্ট হয়

না। অনুতোষ সেদিকে রঙ্গনাথনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "আমরা বোধ হয় ফিরিঙ্গি-বেল্লায় এসে পড়লাম। এখান থেকে বড় দরিয়া পাঁচ ক্রোশ।"

ফিরিঙ্গি-কেল্লার একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। আসলে ওটা ঠিক কেল্লা নয়—গীর্জা বলা যেতে পারে। এক সময়ে সুন্দরবনে যখন পর্তুগীজ জলদস্যুরা উৎপাত শুরু করেছিল তখন তারা এখানে একটা ছোটখাট কুঠি বানায়। কুঠি হলেও সুরক্ষিত কুঠি। তাই লোকে বলত কেল্লা। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই কুঠির বিশেষত্ব ছিল এর ভিতরকার একটি গীর্জা। বৃত্তি হিসেবে দস্যুতা গ্রহণ করলেও এই সব পর্তুগীজদের কারো কারো ধর্মকর্মেও খানিকটা মন ছিল, কিংবা, বলা যায়, ভয় ছিল। সারাদিনের পাপ-ক্ষালনের জন্য মাঝে মাঝে উপাসনা করলে হয়তো পরকালে রেহাই পাওয়া যাবে এই রকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়েই হয়তো তারা এই কুঠির মধ্যে একটি গীর্জাও তৈরি করে নেয়। গীর্জার যিনি আচার্য ছিলেন দস্যুবৃত্তিতে তাঁরও যে দক্ষতা কিছু কম ছিল এমন মনে করলে ভুল হবে! ইতিহাসে এ রকম আরও অনেক চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। যাই হোক, ফিরিঙ্গি-কেল্লা বা কুঠির গীর্জায় যে মাঝে মাঝে ধর্মকথাও শোনান হ'ত তার প্রমাণ স্বরূপ গীর্জার উঁচু চূড়াটা এখনও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও ভিতরের কেল্লা বা কুঠি এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কোথাও ছাদ ভেঙে পড়েছে, কোথাও দেয়াল ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বড় বড় বনস্পতি। লোকে দূর থেকে ওকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, কিন্তু কাছে যেতে সাহস পায় না। গুজব, ভিতরে এক সময় বাঘের আড্ডা ছিল। এখন কী, কেউ জানে না।

হঠাৎ রঙ্গনাথন্ দাঁড় থামিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে অনুতোষকে থামতে বলল, তারপর আঙুল বাড়িয়ে একটা ফাঁড়ির দিকে ইশারা করল। হ্যাঁ, অনুতোষও দেখতে পেয়েছে। খাল থেকে একটা ছোট শাখা ডানদিকে ফাঁড়ির মত বেরিয়ে গেছে; এবং তারই মুখে আবছা অন্ধকারে গাছের নীচে প্রকাণ্ড কি, একটা বাঁধা রয়েছে মনে হচ্ছে।

এবারে দু'জন সন্তর্পণে নিঃশব্দে ডিঙিটা ফাঁড়ির মুখে নিয়ে এল। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই। প্রকাণ্ড একটা বজরা বাঁধা রয়েছে গাছের নীচে। কিন্তু না, ভিতরে কেউ নেই।

তা হলে? তা হলে আরোহীরা গেল কোথায়? তবে কি ঐ ফিরিঙ্গি কেল্লাতেই গিয়ে ঢুকেছে সবাই? ওটা কি তবে বাঘের বদলে এখন ডাকাতদের আড্ডা?

হাল্কা ডিঙিটাকে সন্তর্পণে ডাঙায় তুলে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে ওরা বেরিয়ে এল। রঙ্গনাথন্ আবার কান খাড়া করে কি যেন শুনতে লাগল। বলল, "একটা তর্জনগর্জনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যেন! নিশ্চয় ঐ কেল্লা থেকে। চল্, এগোই।"

অনুতোষ দু'পা এগিয়েই, "দাঁড়া।"—বলে ডিঙিটায় ফিরে গেল। ডাক্তার দ্বিবেদীর লং-কোটটা টেনে বার করে মুখের কাছে নিয়ে অনেকক্ষণ কি পরীক্ষা করল, তারপর বল্ল, "চল।"

নিস্তব্ধ রাত্রি। আকাশ ভরা তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে। চাঁদও সাধ্যমত আলো ছড়াচ্ছে। দু'জনে সন্তর্পণে চোরকাঁটা আর বুনো ঘাস এড়িয়ে এগিয়ে চলল কেল্লার দিকে।

কেল্লার চারদিকে প্রাচীর, কিন্তু বেশির ভাগ জায়গাই ধ্বসে পড়েছে, যদিও তার ফলে ভিতরে ঢোকা সহজসাধ্য হয় নি। ভাঙ্গা ইটের পাঁজা আর জঙ্গল এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে অতি বড় সাহসী লোকেরও সেদিকে এগোতে ভয় লাগে। একটা জায়গায় সামান্য একটু ফাঁক দেখে অনুতোষ পা বাড়িয়েছিল, রঙ্গনাথন্ সঙ্গে সঙ্গে এক হেঁচকায় তাকে টেনে আনল। কারণটা পরক্ষণেই জানা গেল। যে ঝুলন্ত ডালটাকে ধরে অনুতোষ লাফিয়ে প্রাচীর পার হবে ভেবেছিল আসলে সেটা গাছের ডাল নয় একটা বিরাটকায় ময়াল সাপ।

তবু যেতে হবে। ডাক্তার দ্বিবেদীকে যে এখানেই ধরে আনা হয়েছে সে বিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ।

প্রায় আধঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় একটা সরু পথ পাওয়া গেল। গাছপালা ছাঁটাই করে সদ্য সদ্য কেউ ওটা তৈরি করেছে তাও বোঝা গেল।

রঙ্গনাথন্ আবার কান পেতে শুনতে লাগল। ভিতরের তর্জন-গর্জন তখন থেমে গেছে। মাঝে একটু ফিস্‌ফিস্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল, এখন তাও নেই। এখন শব্দটা নিঃশ্বাসের। মানুষ ঘুমোবার সময় যে রকম নিঃশ্বাসের শব্দ হয় ঠিক তাই।

কোনো ঘরেই জানালা-কপাট নেই। সুতরাং ভিতরে ঢুকে পড়া কিছুই কঠিন নয়। গীর্জার চূড়ার ঠিক নীচেকার ঘরটাই সবচেয়ে বড় এবং অক্ষত রয়েছে। এই ঘরেই হয়তো সবাইকে পাওয়া যাবে।

সত্যি পাওয়া গেল। পাঁচ ছ'টা জোয়ান জোয়ান ষণ্ডা গোছের লোক মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। ওদের মধ্যে একজনের পোশাকটা

একটু জমকালো অন্তদের চাইতে। তার বিরাট মুখখানা থেকে থেকে নড়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হাসছে সে। তবে হাসিটা বড় বাঁকা।

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েই কিন্তু থমকে গেল অনুতোষ। বহুদিনের কথা তবু আবছা মুখটা মনে পড়ে। এই লোকটাই না তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে, নানা রকমে বিশ্বাস জাগিয়ে শেষে একদিন কোথায় নিয়ে গিয়েছিল! কি ভাবে —কি কৌশলে কিছুই মনে নেই তার। কিন্তু লোকটাকে ঠিক মনে আছে। ভাগ্যিস দাদু ছিলেন! তিনিই তো লোকটার কাছ থেকে তাকে উদ্ধার করেন। তারপর কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন। দাদুর হালচাল একটু অদ্ভুত, কিন্তু মানুষটির তুলনা হয় না। কিন্তু এ লোকটা এখানে কেন? এতদিন পরে দাদুর ওপর শোধ নিতে এসেছে? নিশ্চয়ই তাই।

রঙ্গনাথন্‌কে কথাটা বলতে হবে। কিন্তু এখন নয়। তাকেও তো এই লোকটাই কিড্‌ন্যাপ্‌ করেছিল। রঙ্গনাথন্‌ কি ওকে চিনতে পারে নি? কিন্তু না, চুপ্‌। আগে দাদুকে চাই।

কিন্তু ডাক্তার দ্বিবেদী তো ওখানে নেই! নিশ্চয়ই তাঁকে আর কোথাও আটকে রেখেছে। খুঁজে বার করতে হবে। কেমন ক'রে? অনুতোষের পক্ষে হয়তো তা অসাধ্য হবে না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাক ভরে নিঃশ্বাস নিল অনুতোষ। যেন সমস্ত পরিস্থিতিটা মোকাবেলা করবার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছে সে। তারপর রঙ্গনাথনের হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে এল।

সেই নিথর পরিত্যক্ত ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল অনুতোষ। মাঝে মাঝে থামছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আবার এগিয়ে চলেছে। যেন এই পরিত্যক্ত পুরীর সবই তার চেনা।

—দশ—

অনুতোষ চলেছে। যন্ত্রচালিতের মত রঙ্গনাথন্‌ও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। অন্ধকারে ঠিক মত পা ফেলা যায় না, কিন্তু অনুতোষের চলা তাতে বন্ধ হচ্ছে না।

অবশেষে, চলতে চলতে মনে হ'ল, তারা একটা সুড়ঙ্গের মুখে এসে পড়েছে। আরও মনে হ'ল ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখাও বেরিয়ে আসছে যেন। অনুতোষ একটুও ইতস্তত: না করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। পেছন পেছন রঙ্গনাথন্‌ও।

সুড়ঙ্গটা তেমন বড় নয়, আর শেষ হয়েছে একটা ছোট কুঠুরীর মধ্যে। সম্ভবতঃ পর্তুগীজ আমলে এটা একটা গুপ্তগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। কারণ, মনে হ'ল ঐ সুড়ঙ্গ ছাড়া ওখানে ঢুকবার আর দ্বিতীয় পথ নেই। তা ছাড়া ঘরটা যেন মাটির একটু নীচে।

সাহসে ভর করে আলো লক্ষ করে দু'জনে এগিয়ে চলল। অনুতোষ তখনও নিঃসন্দেহ যে এখানেই দাদুকে পাওয়া যাবে।

ঘরের এককোণে, দেখা গেল, সত্যি একটি লোক শুয়ে আছে। তার হাত-পা শক্ত-করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। কথা বার করার জন্য হয়তো তার ওপর কিছু অত্যাচারও হয়েছে,—কারণ কপালে, হাতে—নানা জায়গায় কতগুলো কালশিরার দাগ সেই স্বল্প আলোকেও চোখে পড়ছে।

হ্যাঁ, অনুতোষের অনুমান নির্ভুল। লোকটি আর কেউ নয়, ডাক্তার দ্বিবেদী।

ঘরে আর দ্বিতীয় লোক ছিল না। এখানে, এ অবস্থায় কোনও পাহারা রাখার দরকার আছে এ কথা কেউ ভাবে নি। ডাক্তার দ্বিবেদীও নিঝুমের মত পড়েছিলেন, হঠাৎ কানের কাছে অস্পষ্ট স্বরে 'দাদু' ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। অনুতোষ ইশারায় চুপ করতে বলল। রঙ্গনাথন্ একবার কান খাড়া করে কি শুনবার চেষ্টা করল, তারপর নিশ্চিন্ত ভাবে বলল, "না, ভয় নেই। ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।"

কিন্তু এভাবে তো বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না! দু'জনে মিলে চট্‌পট ডাক্তার দ্বিবেদীর বাঁধনগুলো খুলে ফেলল। তারপর সবাই মিলে এখন কি করা যায় তাই নিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। যে পথে এসেছে সেই পথেই ফিরবে কি? না, তাতে ধরা পড়ে যাবার ভয় বেশি।

ডাক্তার দ্বিবেদী বললেন, "সুড়ঙ্গ দিয়ে যখন এই গুপ্তগৃহে ঢোকার ব্যবস্থা হয়েছে তখন এখান থেকে বেরোবারও কোন গুপ্ত-দরজা নিশ্চয়ই আছে। দেখ, দেয়ালের কোনও জায়গা ফাঁকা পাও কিনা।"

অনুতোষ দেয়ালে টোকা মেরে মেরে দেখতে লাগল। না, দেয়ালে কিছু নেই। কিন্তু পায়ের কাছটা ভিজে ভিজে লাগছে কেন? পাথরের মেঝের ফাটল দিয়ে জল উঠছে মনে হয়।

তখন দু'জনে মিলে সেই পাথরটা নাড়াতেই দেখা গেল পাথরটা আল্‌গা হয়ে

উঠে আসছে আর তার তলায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। অনুতোষ আলোটা নিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং পরক্ষণেই স্বস্তির হাসি হেসে বলল, "সিঁড়ির পরেই রয়েছে গুপ্ত-দরজা, আর তার পাশেই সেই খাল। এই সিঁড়ি দিয়ে নামলেই খালের ধারে গিয়ে পৌছানো যাবে। জোয়ার আসছে বোধ হয়, তাই জলের তোড়ে ফাটল দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আর দেরী নয়। দাদু, তুমি হাঁটতে পারবে তো?"

ডাক্তার দ্বিবেদী দৃঢ়স্বরে বললেন, "পারতে হবেই।"

ধীরে—অতি সন্তর্পণে তিনজন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন! মাত্র কয়েক পা, তারপরই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। এ তো শুধু মুক্ত বাতাস নয়, এ যে মুক্তির বাতাস! রঙ্গনাথন্ আর একবার কান খাড়া করে কি শুনল, তারপর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল, "ওরা এখনও ঘুমুচ্ছে। এখনও নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।"

ডিঙ্গি বজরার চেয়ে অনেক জোরে যাবে। সুতরাং সবাই মিলে ঝোপের আড়াল থেকে ডিঙ্গিটা টেনে বার করল। প্রাণপণে বেয়ে যদি রাত ভোর হবার আগে সুবলচকে পৌছতে পারা যায় তবেই বাঁচোয়া। কারণ সেখানে লোকের বসতি আছে। একবার হাজির হতে পারলে আক্রমণের আশঙ্কা কম। তারপর? তারপর কী কর্তব্য ওখানে গিয়ে ভাবা যাবে।

ডাক্তার দ্বিবেদী বললেন,—"ওরা টের পেলেই আমাদের খোঁজে বেরুবে। যাবার আগে বজরাটার একটা ব্যবস্থা করে যাওয়া দরকার।"

অনুতোষ আর রঙ্গনাথন্ তখনই ছুটল বজরার দিকে। একটু চেষ্টা করতেই তলাকার কয়েকখানা কাঠ আল্‌গা হয়ে গেল। সেগুলো খুলে নিয়ে তিনজনে ডিঙ্গিতে উঠে বসল। এদিকে বজরার মধ্যে হু-হু ক'রে জল ঢুকতে লাগল। একটু পরেই পাটাতন, এমন কি বজরায় ঢুকবার দরজাও অনেকখানি জলের নীচে চলে গেল—শুধু মাথাটুকু জলের ওপর জেগে রইল। দড়ি খুলে একটু বেশি জলে ঠেলে দিতেই সেটুকুও জলের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরাও কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে নৌকো ছেড়ে দিল।

সারা রাত ছুটে চলল ডিঙ্গি। ভোরের আগেই সুবলচকে পৌছে গেল সেটা।

সুবলচকের সাপ্তাহিক হাটের কথা আগেই বলেছি। হাট ছাড়াও সেখানে কয়েকটা স্থায়ী দোকান আছে। তা ছাড়া বাইরে থেকেও ব্যাপারীরা মাঝে মাঝে মহাজনী নৌকো নিয়ে এখানে আসে ব্যবসার খাতিরে; নৌকো বোঝাই করে

দামী দামী কাঠ নিয়ে যায়। এ অঞ্চলের মধু, হরিণের চামড়া প্রভৃতি নানা রকম বনজ সম্পদেরও চাহিদা আছে বাজারে। কোন কোন গাছে গালাও পাওয়া যায়, যদিও খুব বেশি নয়। ঐ রকম একটা মহাজনী নৌকো ধরতে পারলে অল্প আয়াসেই মৌখালি পর্যন্ত চলে যাওয়া যেতে পারে। আর মৌখালি থেকে তো দস্তুরমত স্টীমার সার্ভিস্ই আছে গোসাবা, হাঁসখালি প্রভৃতি জায়গার সঙ্গে।

ডাক্তার দ্বিবেদী সুবলচকে এসে এই রকম একটা মহাজনী নৌকোর খোঁজ করতে লাগলেন। এখানকার বিখ্যাত ব্যাপারী কাসেম আলি ওঁদের আগেই চিনত। সে-ই ব্যবস্থা করে দিল। সুন্দরবনের অজ্ঞাতবাস শেষ করে তবে কি ডাক্তার দ্বিবেদী আবার শহরে ফিরে আসবেন?

—এগারো—

বিশ্বতোষ বাবু হঠাৎ একখানা টেলিগ্রাম পেয়ে হকচকিয়ে গেলেন। টেলিগ্রামখানা এসেছে কাকদ্বীপ অঞ্চল থেকে। প্রেরক হিসেবে তলায় যাঁর নামটি লেখা আছে তাঁর সঙ্গে বিশ্বতোষ বাবুর কখনও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল বলে ওঁর মনে পড়ছে না। কিন্তু ওতে যে খবরটি দেওয়া আছে তা ওঁর কাছে অভাবনীয়। সংক্ষিপ্ত খবর: "অনুতোষকে নিয়ে কাল সকালে আপনার কাছে যাচ্ছি—দ্বিবেদী।"

টেলিগ্রামখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, এমন সময় হঠাৎ সশব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিয়েই শুনতে পাওয়া গেল পরিচিত স্বর— "হ্যালো, মিস্টার বাগচী? আমি বরদাচারী কথা বলছি। এইমাত্র একটা অদ্ভুত টেলিগ্রাম পেলাম। কে সাম্ দ্বিবেদী তার করেছেন। তিনি নাকি কাল সকালেই রঙ্গনাথন্‌কে নিয়ে আমার কাছে আসছেন। অ্যাঁ, কি বললেন? আপনিও ঠিক ঐ রকম একটা তার পেয়েছেন? অনুতোষকেও নিয়ে আসছেন ভদ্রলোক? বলেন কি! আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না! নাকি এ আবার কোন নতুন ষড়যন্ত্রের ফাঁদ! না-না, এমনি বলছি। না হলেই ভালো। রাজলক্ষ্মী তো সারা বাড়ি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। অ্যাঁ, রুমাও তাই করছে? তা করবেই তো, দু'জনেই তো ভাই-অন্ত প্রাণ।"

আর ঠিক সেই দিনই কাশীপ্রসাদ বাবুও ঐ রকম একখানা টেলিগ্রাম পেলেন: "কয়েক বছর আগে আপনাদের সরকারী পুঁথিশালা থেকে কয়েকখানা

দুষ্প্রাপ্য পুঁথি লোপাট হয়েছিল—আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে? সেই পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। শীগ্‌গিরই পুঁথিগুলি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করছি।—ইতি, ডাক্তার দ্বিবেদী।"

বলা বাহুল্য কাশীপ্রসাদ বাবুও কম হকচকিয়ে যান নি। শুধু পুঁথি পাবার খবরে নয়, ডাক্তার দ্বিবেদীর মত অমন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের অমন ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর পুনরাবির্ভাবে সে বিস্ময় যেন আরও বেড়ে গেল।

রঙ্গনাথন্ আর অনুতোষকে তাদের নিজের নিজের আত্মীয়-পরিজনদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে ডাক্তার দ্বিবেদী তাঁর নিজগৃহে ফিরে এলেন। খবর পেয়ে তাঁর বন্ধুমহলে হৈ-চৈ পড়ে গেল, কিন্তু তার চেয়েও আলোড়ন জাগল খবরের কাগজের রিপোর্টারদের মধ্যে। সঠিক ঘটনার বিবরণ জানার জন্য তাঁরা দিবারাত্তির হানা দিতে লাগল তাঁর বাড়িতে। ডাক্তার দ্বিবেদী প্রায় অস্থির হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর কাছে কাউকে আসতে হবে না, তিনি নিজেই এ বিষয়ে একটি বড় বিবৃতি তৈরি করছেন। তৈরি হলেই সাধারণের কৌতূহল মেটাবার জন্য এবং সরকারকে তাঁদের কর্তব্য নির্ধারণের সুযোগ দিয়ে সেটি প্রকাশের জন্য সমস্ত পত্রিকায় পাঠিয়ে দেবেন।

যথাসময়ে সে বিবৃতি কাগজে প্রকাশিত হ'ল। সেই বিবৃতি থেকে গল্পের জন্য যেটুকু দরকার বেছে নিয়ে এখানে তুলে দিলাম।

—বারো—

···আমি, ডাক্তার শ্রীসত্যনারায়ণ দ্বিবেদী, সুস্থ দেহে, সুস্থ মস্তিষ্কে এবং অন্যের প্ররোচনা ব্যতিরেকে এই বিবৃতি লিপিবদ্ধ করছি।

ডাক্তারী শাস্ত্রের ওপর আমার বরাবরই খুব ঝোঁক এবং আপনারা সকলেই জানেন চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমি মোটামুটি সাফল্যই লাভ করেছি। বিশেষ ক'রে, লোকে বলে, অস্ত্রচিকিৎসায় নাকি আমার সমকক্ষ এদেশে খুব বেশি নেই। হয়তো একটু বাড়িয়েই বলে। তবে অস্ত্রচিকিৎসক হিসেবে আমি যে অর্থোপার্জন নেহাৎ খারাপ করি নি এ কথা অস্বীকার করব না।

কিন্তু অর্থোপার্জনই তো সব নয়! আমার মতে যিনি অসাধারণ কিছু দেখাতে পারেন তিনিই সার্থক চিকিৎসক।

অল্প বয়স থেকেই আমার নানা বিষয়ে কৌতূহল খুব বেশি। এজন্য আমি

ডাক্তারী শাস্ত্র ছাড়াও নানান্ ধরনের জ্ঞানের বই—বিজ্ঞানের বই—নানা রকম ভাষা শিখেছিলাম। সংস্কৃত ভাষা আমি ভালোই জানি। পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষাও শিখেছি। এমন কি কিছু কিছু তিব্বতী, নেপালী, আরবী এবং ফারসীও শিখেছি। এ সব ভাষা শিখবার একটা নিগূঢ় কারণ হচ্ছে এই যে, আমি ঐ সব ভাষাভাষী প্রাচীন পণ্ডিতদের চিন্তাধারার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস, তাঁদের রচিত কোন কোন প্রাচীন হাতে-লেখা পুঁথির মধ্যে এমন সব সম্পদ্ লুকানো আছে যা আমরা বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও খুঁজে বার করতে পারি নি।

জীবজগৎ সম্বন্ধেও নানা রকম তথ্য ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমার নানা বিষয়ে কৌতূহল হয়েছিল। আমি লক্ষ করেছিলাম কতকগুলি ইতর প্রাণীর মধ্যে এমন কতকগুলি সহজাত ক্ষমতা আছে যা মানুষের মধ্যে নেই। যেমন ধরুন, ঘ্রাণশক্তি। কুকুরের ঘ্রাণশক্তির কথা কে না জানে? কুকুরের মতন বাঘ, চিতা প্রভৃতি জন্তুর মধ্যেও ঐ রকম ঘ্রাণশক্তি দেখা যায়। কুকুর একবার যে গন্ধ শোঁকে তা সহজে ভুলতে পারে না—আর এই গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে অনেক অসাধ্যসাধন ক'রে দিতে পারে। আপনারা পুলিস বিভাগের শিক্ষিত গোয়েন্দা কুকুরের কথা শুনেছেন। অপরাধীর ব্যবহৃত কোন জামা বা ঐ রকম কোন জিনিসের গন্ধ শুঁকিয়ে তাকে ছেড়ে দিলে সে সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে অপরাধীকে ঠিক সনাক্ত ক'রে দিতে পারে। এমন কি অপরাধী যে পথ দিয়ে চলে গেছে গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক সেই পথ ধরে অনুসরণ করাও তার পক্ষে কঠিন নয়।

কুকুরের যেমন ঘ্রাণশক্তি তেমনি কোন কোন প্রাণীর আছে শ্রবণশক্তি। বাদুড়কে এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রতিভাবান্ বলা যেতে পারে। যে সব অজানা শব্দ আমাদের কানে একেবারেই ধরা পড়ে না বাদুড়ের কাছে ঠিক তা ধরা পড়ে। বহুদূরের শব্দ, খুব ধীর ফিস্-ফিস্ শব্দ—তাও সে বুঝতে পারে। এজন্য আজকাল বিজ্ঞানীরা বাদুড়কে বলেন জ্যান্ত র‍্যাডার। র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে কি করে বহুদূরের অদৃশ্য প্লেন বা জাহাজের অস্তিত্ব ধরা পড়ে তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।

অস্বাভাবিক ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তির মত আরও নানা রকম অস্বাভাবিক শক্তি কোন কোন ইতর প্রাণীর আছে যা মানুষের নেই। কেন নেই এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমার মনে এসেছিল, এবং আমি অনুসন্ধান ক'রে জেনেছিলাম যে 'নেই' কথাটা বলা ঠিক নয়, বলা উচিত মানুষের এ ক্ষমতাগুলি 'লোপ পেয়েছে'।

বিজ্ঞানে একটা কথা আছে—ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে প্রাণীরা যেমন এক

একটা ক্ষমতা অর্জন করে তেমনি ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে এক একটা ক্ষমতা হারিয়েও ফেলে। যেমন ধরুন, জিরাফের গলা লম্বা কেন? কারণ, জিরাফের যা প্রিয় খাদ্য,—গাছের কচি পাতা, তা গাছের অনেক উঁচুর দিকেই গজায়, নীচের দিকে মেলে না। সেটা খেতে গেলে ঘাড় উঁচু করে তবেই তা খেতে পারা যায়। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে বেশ কয়েক পুরুষ পরে দেখা গেল জিরাফের ঘাড়ই আগের তুলনায় লম্বা হয়ে গেছে। আবার দেখুন, বেশীর ভাগ পাখি উড়তে পারে কিন্তু উটপাখি উড়তে পারে না। এর কারণ উটপাখি যেখানে বাস করে সে অঞ্চলে তার প্রয়োজনীয় জিনিস সে ডাঙাতেই এত সহজে পায় যে তার আর উড়ে গিয়ে গাছে উঠে তা সংগ্রহ করতে হয় না। কাজেই পাখা থাকলেও উটপাখি তার ব্যবহার করত না। ফলে বহু পুরুষ পরে দেখা গেল তার উড়বার ক্ষমতাই চলে গেছে।

মানুষের বেলায়ও ঠিক ঐ রকমটি হয়েছে। বন্য মানুষ সর্বদা শত্রুদের মধ্যে বাস করত। নানা রকম হিংস্র প্রাণীরা তার এই শত্রু। সেই জন্য মানুষকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হ'ত। কান পেতে শুনতে হ'ত তাদের আসা-যাওয়ার শব্দ, নিঃশ্বাসের সঙ্গে শুঁকে শুঁকে খুঁজে দেখতে হ'ত কোথায় শত্রু আছে। সুতরাং তখন মানুষের ঐ সব ইন্দ্রিয় খুবই সজাগ ছিল। ঠিক কুকুরের মত ঘ্রাণশক্তি বা বাদুড়ের মত শ্রবণশক্তি মানুষের না থাকলেও তার ঐ সব শক্তি যে এখনকার মানুষের চেয়ে অনেক তীব্র ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঐ সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলেই ও সব ক্ষমতাও তার ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে এসেছে।

কিন্তু মানুষের এই সব লুপ্ত ইন্দ্রিয় বা লুপ্ত ক্ষমতা কি নেহাৎ তুচ্ছ করবার মতন? ধরুন, আমরা যদি কোন রকমে ঐ সব ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে আনতে পারতাম তা হলে একালের বুদ্ধিমান্ মানুষ আরও কত বড় শক্তিমান্ হ'ত! তখন হয়তো কিছুই তার অসাধ্য থাকত না। সম্পদকে আমরা বলি ধন। লুকানো টাকাপয়সাকে বলি গুপ্তধন। আর সেই গুপ্তধন দৈবাৎ পেয়ে গেলে নিজেদের কত ভাগ্যবান্ মনে করি। সেইভাবে, এই লুপ্ত সম্পদকেও আমরা অনায়াসে বলতে পারি আমাদের লুপ্তধন—যে ধন হারিয়ে গেছে। আরব্যো-পন্যাসের দৈত্যের মত আবার যদি আমরা তাকে উদ্ধার করে ঘড়ায় বন্দী করতে পারি তা হলে সে লুপ্তধন আমাদের কত বড় সম্পদ্ হতে পারে। তা কি সত্যি উদ্ধার করা যায় না?

ভারতীয় ঋষিরা নানা রকম যৌগিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ ক'রে গেছেন। সেই সব প্রক্রিয়া সাধন করতে পারলে মানুষ অনেক অস্বাভাবিক ক্ষমতা লাভ করতে পারে। কিন্তু এই সব প্রক্রিয়ার বিবরণ প্রায়ই হারিয়ে গেছে। তন্ত্র শাস্ত্রেও এর কিছু কিছু উল্লেখ ছিল। কাজেই আমি খুঁজে খুঁজে ঐ ধরনের পুঁথি সংগ্রহ ক'রে পড়ে দেখতে লাগলাম। নিজের বিদ্যেয় যখন কুলোত না তখন আমি ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের সাহায্য নিতেও ছাড়তাম না।

ঐ সঙ্গে আমি আরও একটা পরীক্ষা শুরু করলাম। ডাক্তারী শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা,—বিশেষ ক'রে অস্ত্রচিকিৎসক হিসেবে আমার ধারণা হ'ল যে আমাদের শরীরের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্নায়ুর ওপর সঠিক ভাবে অস্ত্রোপচার করতে পারলে তাকে আরও সতেজ ক'রে তোলা যেতে পারে। আর আমাদের ঐ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি ঐ সব স্নায়ুর শক্তির ওপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এ বিষয়েও আমি নানা দুষ্প্রাপ্য বই নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম এবং নিজের অপারেশন থিয়েটারেও দস্তুরমত ও নিয়ে গবেষণা আরম্ভ ক'রে দিলাম। যে সব প্রাণীর ঐ সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা খুব বেশি তাদের নিয়ে পরীক্ষা চালালাম। যাদের কম তাদের নিয়েও। শুধু তাই নয়, এই অস্ত্রচিকিৎসা আর যৌগিক প্রক্রিয়া একত্র করে ব্যাপারটাকে আরও ত্বরান্বিত করা যায় কিনা সেও হ'ল আমার আর এক চেষ্টা।

এই সময় খবর পেলাম নামচি জং মনস্টারী থেকে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য তান্ত্রিক পুঁথি এসেছে যার তখনও সঠিক পাঠোদ্ধার হয় নি। বলা বাহুল্য, তখনই ছুটলাম সরকারী পুঁথিশালায় এবং, আশ্চর্য, ওগুলো কিছুদিন নাড়াচাড়া করে ওর কিছু কিছু পুঁথির পাঠোদ্ধারও করে ফেললাম। দেখলাম, আমি যা চাইছিলাম তাই-ই আছে ঐ পুঁথিতে।

আমার আর কপি করার সবুর সইছিল না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে একদিন কাশীপ্রসাদ বাবুর অনুপস্থিতিতে কিছু পুঁথি সরিয়ে ফেললাম। শহরে আমার যে প্রতিপত্তি তাতে আমাকে যে কেউ চোর বলে সন্দেহ করবে না এ বিশ্বাসের বলেই এটা করা সম্ভব হ'ল।

কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, ঐ সব যৌগিক ব্যায়াম—যৌগিক প্রক্রিয়া আমার পক্ষে করা কি সম্ভব? তা ছাড়া আমি তো শুধু ওরই ওপর নির্ভর করতে চাই না—সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু অস্ত্রোপচারও করতে চাই যে। নিজের ওপর তো আর নিজে অস্ত্রোপচার করা যায় না।

মনে হ'ল, বেশি নয়, গুটি দুই ছোট ছেলে,—বেশ চালাকচতুর—শিক্ষিত পরিবারের দু'টি ছেলে,—যদি যোগাড় করতে পারি তা হ'লে আমার পরীক্ষা হয়তো সফল হয়। ওদের ওপর অস্ত্রোপচার করে, তারপর ওদের দিয়ে ঐ সব প্রক্রিয়া শিখিয়ে নিতে পারলে হয়তো আমি পৃথিবীতে একটা কাজের মত কাজ ক'রে যেতে পারব।

আমার আর তর সইছিল না। কিন্তু কে আমাকে এই সব শর্তে ছেলে ছেড়ে দেবে? তখন আমার মাথায় খুন চেপে গেল। বিজ্ঞানের জন্য আমি কোন দুষ্কর্মকেও কেয়ার করব না। ছলে-বলে-কৌশলে যে ভাবে হোক দু'টি ছেলে অন্ততঃ আমার চাই-ই—দু'টি পরীক্ষার জন্য।

সুযোগও জুটে গেল অভাবনীয় ভাবে। এক ছেলেধরা গুণ্ডা ধরা পড়তে পড়তে আহত হ'য়ে ভর্তি হ'ল এসে হাসপাতালে, আমারই ওয়ার্ডে। কথা প্রসঙ্গে সে আমার কাছে সব কথাই বলল। এও বলল যে তাদের দলের সর্দার হচ্ছে ভুল্লু। টাকা পেলে সে যে ভাবেই হোক, যেখান থেকেই হোক, ছেলে ধরে নিয়ে আসতে পারে। সে-ই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল। ভুল্লু সর্দারকে টাকা কবুল ক'রে আমি দুই সোনার চাঁদ ছেলে অনুতোষ আর রঙ্গনাথন্‌কে চুরি করিয়ে আনালাম। অবশ্য ওদের অচেতন ক'রে রাখবার জন্য ওষুধপত্র যা লাগে আমিই যুগিয়েছিলাম ; ভুল্লু আমার হয়ে, দশ হাজার টাকার বিনিময়ে কাজটা হাসিল ক'রে দিয়েছিল।

এইবার আসল কাজ। ছেলে দু'টির ওপর অস্ত্রোপচারটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ওদের জ্ঞান হবার আগেই; সেরে নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে এলাম সুন্দরবনের সেই নির্জন ভগ্নপুরীতে। জায়গাটা অবশ্য আগে থেকেই ঠিক করা ছিল—তবে বেনামীতে। কেউ টের পেল না। তা ছাড়া আমার তো স্ত্রী-পুত্র বা অন্য কোন নিকট-আত্মীয় নেই, কাজেই আমি নিরুদ্দেশ হ'লে দু'-চারদিন হৈ-চৈ হবার পর ব্যাপারটা নিয়ে কেউ যে তেমন মাথা ঘামাবে না এ বিশ্বাস আমার ছিল।

সুন্দরবনে এসে ছেলে দু'টিকে গড়ে তোলার কাজে আমার সর্বশক্তি ব্যয় করলাম। ওরা জানত না যে আমিই ওদের কিড্‌ন্যাপ্‌ করিয়েছি। উল্টে ওরা আমাকেই ওদের গুণ্ডার-হাত-থেকে-উদ্ধারকর্তা মনে ক'রে আমার ভীষণ অনুগত হয়ে পড়ল। আমি হলাম ওদের দাদু। রঙ্গনাথন্ বাংলা শিখে গেল, আর দু'জনেই যৌগিক প্রক্রিয়া অভ্যাস করতে লাগল আমার নির্দেশমত। অনুতোষের ঘ্রাণশক্তি অল্পদিনেই অসম্ভব রকম বেড়ে উঠল, আর রঙ্গনাথনের

বাড়ল শ্রবণশক্তি। আমার সার্থক অস্ত্রোপচারের সঙ্গে ভারতীয় ঋষির যৌগিক প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়েই এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হ'ল। ওরা ফিরে পেল ওদের লুপ্ত ইন্দ্রিয়—ওদের পূর্বপুরুষেরা যা হারিয়েছিল সেই পরম সম্পদ্ লুপ্তধন।

ডাক্তার দ্বিবেদী এর পরে ভুল্লু সর্দারের ভ্রান্ত ধারণার বশে আচমকা তাঁকে আক্রমণ এবং কি করে অনুতোষ ও রঙ্গনাথন্ কেবল মাত্র তাদের নবলব্ধ ক্ষমতা—যাকে তিনি বারে বারে লুপ্তধন বলে বর্ণনা করেছেন—তারই সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করল সে কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন। তারপর লিখেছেন—

সমাজের চোখে আমি একজন মস্ত অপরাধী। পরের ছেলে কৌশলে চুরি করার কঠোর অপরাধে আমার দণ্ড অনিবার্য। কারণ আমি আজ সমাজবিরোধী। শুধু তাই নয়, আমি একজন চোরও। সরকারী পুঁথিশালা থেকে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি চুরি করে নিয়েছি। তার জন্যও আমি দণ্ডনীয়। আমার বিচারের ভার আমি দেশবাসীর ওপর ছেড়ে দিলাম। তাঁরা যে দণ্ড দেবেন তা আমি মাথায় পেতে নেব। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক মহাসত্য আমি হাতে-কলমে প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেলাম তার জন্য একটু অনুকম্পাও কি আমি পেতে পারি না?

ডাক্তার দ্বিবেদীর বিবৃতি এইখানেই শেষ হয়েছে।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ডাক্তার দ্বিবেদীর অপরাধ সত্যিই গুরুতর, তাই তাঁকে যথাসময়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু মামলার বিপক্ষ দলের দুই প্রধান সাক্ষী শ্রীমান্ অনুতোষ এবং শ্রীমান্ রঙ্গনাথন্ বেঁকে বসায় সরকার পক্ষ বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। বিশ্বতোষ বাবু এবং মিস্টার বরদাচারীও নাকি এই মামলায় বিশেষ আগ্রহ দেখান নি।

জ্বলন্ত দ্বীপের কাহিনী

সৌমিত্রের জীবনটা যে এমন একটা মোড় নেবে তা তার অতি বড় বন্ধুরাও ভাবতে পারে নি, আত্মীয়স্বজনরা তো নয়ই। ছেলেবেলা থেকেই সৌমিত্র অত্যন্ত গোবেচারা। ঠাকু'মার হাতে মানুষ। ঠাকু'মা যখন যা বলেছেন বেদবাক্যের মত তা পালন করেছে। রাস্তায় সন্ধ্যায় বাতি জ্বলবার পর পারতপক্ষে সে বাড়ির বাইরে থাকে নি। পড়ে যাবার ভয়ে সাইকেল চালাবার চেষ্টা করে নি, জলে ডুববার ভয়ে সাঁতার শেখা দূরে থাক, কোন পুকুরের ধারেকাছেও ঘেঁষে নি। আরও কত রকম নিয়মকানুন, বাধানিষেধের মধ্যে মানুষ হতে হয়েছে তাকে। চা-পানকে বিষ-পান-তুল্য মনে করতে হয়েছে। চিরতার জল, পলতার ক্বাথ, গাঁদালের ঝোল—এগুলিকে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য বলে মেনে নিতে হয়েছে, কত আর ফর্দ দেব? এর ফল যা হবার তাই হয়েছিল। বই—বই আর বই! বই-ই ছিল তার স্বপ্ন, তার ধ্যান, তার ধারণা। এ হেন আদরের খোকন ওরফে সৌমিত্র যে শেষ পর্যন্ত এমন একটা কাজ করে বসবে কে তা ভাবতে পেরেছিল? কেউ না।

ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি। ডাক্তারী পাস করে কোথায় প্র্যাক্‌টিস্ করা যায় এই নিয়ে সৌমিত্র তখন মাথা ঘামাচ্ছে। ঠাকু'মার ইচ্ছা বাড়িতেই, বাইরের ঘরটায় একটু চুন-বালি লাগিয়ে পার্টিশান্ বসিয়ে চেম্বার করা হোক্। তা হলে আর নাতিকে চোখের আড়াল করতে হয় না। ব্যাপারটা এই রকমই পাকাপাকি করে সপ্তাহ খানেকের জন্য তিনি গেছেন কাশী—তাঁর সই ইন্টুমাসির বাড়ি বেড়াতে (এবং সেই সঙ্গে কিছু পুণ্যও সঞ্চয় করতে)। ইতিমধ্যে সৌমিত্র, ব্যস, বলা নেই কওয়া নেই,-কোন্ বন্ধুর সঙ্গে একেবারে আন্দামান! পোর্ট ব্লেয়ারে সেই বন্ধুটির ভগ্নীপতি সরকারী ডাক্তার। বন্ধু বেড়াতে যাচ্ছিল সেখানে, সৌমিত্রও তার সঙ্গী হ'ল।

আর সেই থেকেই ঘটল কাণ্ডটা।

ঠাকু'মার স্নেহবন্ধন থেকে রেহাই পেয়ে সৌমিত্র যে শুধু জীবনে এই প্রথম একটা মুক্তির আস্বাদ পেল তাই নয়, সমুদ্রকেও ভীষণ ভালোবেসে ফেলল সে। প্রথম 'নৌ-যাত্রী' হিসেবে জাহাজে চড়লেও, তার বন্ধু যখন সমুদ্রপীড়ায় কুপোকাৎ

সৌমিত্র তখন ডেকের রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সীমাহীন নীল জলরাশি কেমন ফুলে ফুলে উঠে দিগ্বলয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাঝরাত্রে যখন জাহাজসুদ্ধ লোক ঘুমে ঢলে পড়েছে, শুধু জাহাজের আর একদিকে কার্যরত নাবিকের দল ছাড়া, সৌমিত্র তখনও ডেকে পায়চারি করছে আপন মনে।

পোর্ট ব্লেয়ারে কয়েকটা দিন বেশ ভালোভাবেই কাটল সৌমিত্রের। আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি তো হ'লই না, বরঞ্চ ওর গুরুভারে সংকুচিত হয়ে পড়ল সৌমিত্র। বন্ধুর ভগ্নীপতি সুজিত-বাবু খুব রসিক এবং যাকে বলে 'জমাটি' লোক। দিদিটিও তথৈবচ; তার ওপর অত্যন্ত স্নেহশীলা।

খাওয়াদাওয়ার পর রোজই রাত্রে চাঁদের আলোয় আড্ডা জমত। সেদিনকার আলোচ্য বিষয় ছিল—বাঙালীজীবনে অ্যাডভেঞ্চারের অভাব নিয়ে। সুজিত বাবু বললেন, "এমনিই তো আমাদের ছেলেদের এদিকে উৎসাহ কম, তার ওপর বাড়ির গুরুজনেরা হচ্ছেন প্রবল বাধা। এই দেখ না, আমার এই আন্দামান আসা নিয়েই প্রথমটা কম বাধা পেয়েছিলাম? সেদিন অটার সাহেবের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ওঁদের তো মস্ত জাহাজী কারবার,—মালটানা জাহাজ পৃথিবীর সর্বত্র ছুটোছুটি করছে। বলছিলেন, ওঁদের জাহাজের জন্য কয়েকজন পাস-করা ডাক্তার চাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত একজনও বাঙালী এ কাজে এগিয়ে আসে নি। অথচ বাঙালীর বুদ্ধির ওপর ওঁর ভীষণ শ্রদ্ধা। এখনও একজন বাঙালী ডাক্তার পেলে ওঁরা লুফে নেন। কিন্তু পাচ্ছেন কই? ঘরের নিরিবিলি পরিবেশ ছেড়ে সমুদ্রের দুরন্ত জীবন বেছে নেবে এ রকম বাঙালী কোথায়?"

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল সৌমিত্র; বলল, "আমি যাব। সমুদ্র আমার খুব ভালো লাগে। আপনি অটার সাহেবকে লিখে ব্যবস্থা করে দিন।"

যে জাহাজ কোম্পানীতে সৌমিত্র চাকরি পেল তাদের যাত্রী-জাহাজের চাইতে মালবাহী জাহাজই ছিল বেশি। বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরের এদিক্-সেদিক্ নানা দ্বীপে, যেখানে সাধারণ জাহাজ চলাচল করে না, সেখানে ওদের জাহাজ হামেশাই যাতায়াত করে। সময় সময় চার্টার করেও বড় বড় কোম্পানী নিয়ে যায় ওদের জাহাজ। সৌমিত্র যে জাহাজে কাজ নিল সেটিও এই ধরনের একটি জাহাজ। তবে অল্প কিছু যাত্রী নেবারও ব্যবস্থা ছিল তাতে। জাহাজটিকে চার্টার করে নিয়েছিল এক বিলিতী কোম্পানী।

প্রথম তিন-চার মাস বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটল, কিন্তু তারপরেই একদিন দেখা

দিল বিভ্রাট। সেবার তাদের জাহাজ লবঙ্গদ্বীপে যাবার জন্য চীন সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিল।

চীন সমুদ্রে টাইফুনের কাহিনী সুবিদিত। টাইফুন মানে সামুদ্রিক ঝড়। এক সময়ে প্রতি বছর ওতে বহু লোককে প্রাণ হারাতে হ'ত। ইদানীং অবশ্য সেটা কমেছে কিন্তু এখনও তেমন তেমন ঝড় উঠলে আধুনিক মজবুত জাহাজগুলোকেও দস্তুরমত কাবু হতে হয়।

কিন্তু টাইফুন তো আর রোজ হচ্ছে না। হবেই যে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। নেহাৎই কপালেভদ্রের ব্যাপার ওটা

কিন্তু সৌমিত্রের বরাতই বোধ হয় খারাপ। তিন দিন তিন রাত্রি জাহাজ চলবার পর দেখা গেল ভাড়াটে যাত্রীদের তো বটেই, নাবিকদেরও অনেকে সমুদ্র-পীড়ায় শয্যাগত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ সমুদ্র মোটেই শান্ত নেই। পর পর কয়েকটা কেস্ পরীক্ষা করে সৌমিত্র একটু ভাবিত হয়েই ক্যাপটেনের খোঁজে বেরিয়ে এল। দেখা গেল, তিনি তখন চোখে দূরবীন দিয়ে দূর প্রান্তে কি যেন লক্ষ করবার চেষ্টা করছেন। সৌমিত্র পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই নীরবে দূরবীনটি ওর হাতে দিয়ে দূরে আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—দূরে, দিক্‌চক্রবালে একটা কালোরেখা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে যেন! হতবুদ্ধি সৌমিত্রের দিকে চেয়ে একবার ম্লান হেসে ক্যাপটেন বললেন, "জাহাজ নোঙর করা যায় কিনা দেখি, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল জাহাজে। ভয়ত্রস্ত নাবিকেরা এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি করছে। সমুদ্র এখানে অত্যন্ত গভীর। জাহাজ থামানো প্রায় অসম্ভব। ওদিকে সমস্ত আকাশ ততক্ষণে কালো হয়ে এসেছে। এখনই যেন গাঢ় অমাবস্যার অন্ধকারে সৃষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তার পর? তার পরের কথা বর্ণনা করা কঠিন। সৌমিত্রের জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা আর কখনও হয় নি। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে সে চেতনাও যেন খানিকক্ষণের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল। হ্যাঁ, এরই নাম টাইফুন।

কিন্তু সবেরই শেষ আছে। টাইফুনও এক সময়ে থামল। ঝড় থামলে ক্যাপটেন বেরিয়ে এসে সমস্ত জাহাজ পরীক্ষা করতে লাগলেন। সৌমিত্রকেও ডেকে নিলেন সঙ্গে। লোক মরে নি কেউ, যদিও সকলেই অর্ধমৃত বলা চলে। কিন্তু জাহাজের ক্ষতি হয়েছে আরও বেশি, অনেক জায়গা ভেঙে চুরমার হয়ে

গেছে। এমন ভাবে ভেঙেছে যে অবিলম্বে কোথাও ভিড়িয়ে মেরামত করে না নিলে ডুবে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু কোথায় ভিড়ানো যায়?

না, ঈশ্বর আছেন। হঠাৎ দেখা গেল মাথার ওপর একঝাঁক সামুদ্রিক ঈগল চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো কাছাকাছি ঝড়ে আহত কোনও সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান পেয়েই উড়ে এসেছে ওরা। পাখি যখন এসেছে তখন ডাঙাও হয়তো বেশি দূর হবে না।

যন্ত্রপাতি দেখে, ম্যাপ্-ট্যাপ্ খুলে কোথায় এল জাহাজ তার একটা হদিস বার করার চেষ্টা হ'ল তারপর। মনে হ'ল ১৩০° ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখা ছাড়িয়ে আর ওদিকে ২০° ডিগ্রী অক্ষরেখার মধ্যে কোন একটা জয়াগায় জাহাজ এসে পড়েছে। মূল গন্তব্য স্থান থেকে আন্দাজ শ'পাঁচেক মাইল দূরে হলেও এর কাছাকাছি অনেক ছোটখাট প্রবালদ্বীপ আছে বলে নির্দেশ করা আছে ম্যাপে। খুবই ছোট ছোট দ্বীপ সেগুলি—কোনটা তিন-চার মাইল, কোনটা এক মাইল বা তারও কম হবে,—লম্বায় বা চওড়ায়। যাই হোক্, আপাততঃ এরই একটা খুঁজে নিয়ে জাহাজ তো ভিড়ানো যাক্!

ঝক্‌ঝকে রোদ উঠেছে। সমুদ্রের জল চিক্‌চিক্ করছে, কে বলবে কয়েকঘণ্টা আগে এই সমুদ্রই ভীষণ মূর্তি ধরে জাহাজসুদ্ধ গ্রাস করবার চেষ্টা করছিল?

জাহাজ তর্‌তর্ করে ভেসে চলেছে। ক্যাপটেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে চারদিক্ লক্ষ করছেন। সৌমিত্র পাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ক্যাপটেনকে যেন একটু বিচলিত মনে হ'ল—"ডক্টর রায়, দেখুন দেখুন, ওদিকে যেন আগুনের মত কি একটা দেখা যাচ্ছে না?"

দূরবীনে চোখ লাগিয়ে সৌমিত্রও দেখল। হ্যাঁ, আগুনই মনে হচ্ছে। ও কি দাবানল? গভীর সমুদ্রের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা যুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে যেন!

জাহাজ তার একটু কাছে এলে খালি চোখেই দেখা গেল সবটা। ছোট্ট একটা দ্বীপ। গাছপালা চোখে পড়ে না। আর পড়বেই বা কি করে? সমস্ত দ্বীপ যুড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, একটু তাকাতে গেলেই চোখ ঝলসে যায়! আশপাশের সমুদ্রও সে আলোয় জ্বলে উঠেছে যেন! ক্যাপটেন জাহাজের স্পীড্ আরও বাড়িয়ে দিতে বললেন। এর ধারেকাছে থাকাও নিরাপদ নয়।

কিন্তু জাহাজ কি আর বেশীক্ষণ চালানো যাবে? ক্যাপটেনের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ।

কিন্তু বেশি দূর যেতে হ'ল না। জ্বলন্ত দ্বীপ থেকে কয়েক মাইল দূরে আর একটা দ্বীপ পাওয়া গেল। প্রবালদ্বীপ, কিন্তু গাছপালাও যথেষ্ট আছে। সমুদ্র এখানে একটা ছোট ফাঁড়ির মত হয়ে দ্বীপের মধ্যে ঢুকে গেছে, তাই ভিতরে গিয়ে নোঙর করতেও কষ্ট হ'ল না।

ডাঙায় নেমে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। ছোট্ট একটা ঝরণা কুলুকুলু করে বয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ অঞ্জলি ভরে তার জল পান করতে লেগে গেল। ক্যাপটেন কিন্তু দেরী না করে এঞ্জিনীয়ার আর মেকানিকদের লাগিয়ে দিলেন জাহাজ মেরামতির কাজে, বেশি সময় তো এখানে পড়ে থাকলে চলবে না!

সৌমিত্র দু'জন সঙ্গী নিয়ে দ্বীপটা ঘুরে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। অজানা দ্বীপ, আত্মরক্ষার জন্য বন্দুকও নিল।

জীবজন্তু বড় একটা চোখে পড়ল না। কেবল গাছ—নারকেল, পাম ইত্যাদি জাতের গাছ, যা সমুদ্রের ধারে সচরাচর জন্মায়। আর এক ধরনের গাছ চোখে পড়ল ; ওর নামটা ঠিক মনে নেই কিন্তু সিংভূম অঞ্চলে সৌমিত্র এ-গাছ অনেক দেখেছে। লাল টকটকে পাথুরে মাটি ফুঁড়ে সতেজে বেড়ে উঠেছে গাছগুলি। তারই মধ্যে দিয়ে ছোট একটা পায়ে-চলা পথ। তবে কি এখানে লোকবসতিও আছে নাকি ? থাকলে কি জাতের লোক কে জানে! শেষটায় নরখাদক জংলীদের হাতে পড়তে হবে না তো! বন্দুকটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিল সৌমিত্র।

একটু এগুতেই দ্বীপের বাসিন্দাদের দেখা গেল। তাঁবুর মত ছোট কাঠের ঘর। দেখলেই বোঝা যায় এ ঘর জংলীদের তৈরি নয়, আর যারা তৈরি করেছে তারাও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। জাপানী জেলেরা এই সব সমুদ্রে মাছ ধরে বেড়ায় —এ খবর সৌমিত্রের জানা ছিল। অসম সাহসিক এই জেলেরা ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে দূর দূরান্তরে পাড়ি দেয় মাছের জন্য—এ খবরও জানত সে। এরাও হয়তো এ রকম কোন যাযাবর জাপানী জেলের দল।

অনুমান যে সত্য তাও বোঝা গেল পরক্ষণেই। একটা মস্ত বড় মাছ-ধরা জাল নিয়ে দু'জন জাপানী এদিকেই আসছিল, ওদের দেখে অবাক্ হয়ে গেল তারা। সৌমিত্র এ ক'মাস জাহাজে জাহাজে ঘুরে দু'-চারটে জাপানী কথা শিখেছিল। অভয় দিয়ে অল্পক্ষণেই ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিতে কষ্ট হ'ল না তার। ওদের মধ্যেও আবার একজন চলনসই ইংরেজি জানত। কাজেই ভাবের আদানপ্রদানে কোনই অসুবিধা হ'ল না।

মাছের কারবারী এই জাপানীরা গভীর সমুদ্র থেকে মাছ তুলে নানা জায়গায়

পাঠায়। ফিলিপাইন্‌স্‌ থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত জায়গাটাই প্রায় ওরা চষে বেড়ায়। এই দ্বীপটি ওদের একটা বড় ঘাঁটি। কোন উপদ্রব নেই এখানে, তা ছাড়া সমুদ্রে একটা ফাঁড়ি থাকায় দ্বীপে ওঠা-নামা করা বেশ সহজ। জাপানীরা এর নাম দিয়েছে থাকাসোজা দ্বীপ।

দু'দিন সৌমিত্রের কাটাতে হ'ল ঐ দ্বীপে, আর এইখানেই পাওয়া গেল জ্বলন্ত দ্বীপের কাহিনী।

জ্বলন্ত দ্বীপ হচ্ছে একটা ভৌতিক দ্বীপ। এ অঞ্চলের সকলেই, মানে আশপাশের অন্যান্য দ্বীপে যারা থাকে,—তারাও জানে এই ভৌতিক দ্বীপের কথা। তাই কেউ ওর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে চায় না। সর্বদা দাউ দাউ করে জ্বলছে ঐ দ্বীপ—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর। কতদিন ধরে এই রকম জ্বলছে কেউ জানে না। এ অঞ্চলের যারা খুব প্রাচীন লোক তারা দেখছে ঐ রকম ছেলেবেলা থেকে। তাদের বাপ-ঠাকুরদারাও দেখেছেন এবং গল্প শুনেছেন তাঁদেরও বাপ-ঠাকুরদাদের কাছে আগুনে দ্বীপের সম্বন্ধে। কেউ জানে না এই অনির্বাণ অগ্নিশিখা সৃষ্টির কোন্‌ আদিকাল থেকে ঐভাবে রাবণের চিতার মত জ্বলতে শুরু করেছে। জ্বলছে তো জ্বলছেই। এতখানি জায়গা এতদিন ধরে জ্বালিয়ে রাখতে অফুরন্ত জ্বালানীর দরকার। অমন জ্বালানীর কথা মানুষ জানে না। কোনও কোনও বিদেশী দূর থেকে দেখে ওটাকে কোনও আগুনে পাহাড় বলে কল্পনা করেছেন। কিন্তু সে ধারণা যে ভুল তাও টের পেতে দেরী হয় নি। প্রথমতঃ আগুনে পাহাড় থাকলে ঐ তীব্র আলোকে তা অদৃশ্য থাকতে পারত না। পাহাড় তো দূরের কথা, এ পর্যন্ত আগুনে পাহাড়ের ধোঁয়াও কেউ কোনদিন দেখে নি। গন্ধকের গন্ধও টের পায় নি কেউ। তা ছাড়া এ আগুনটা এখানে জ্বলে অনেকখানি সমতল জায়গা জুড়ে—একটানা। আগুনে পাহাড় কখনও ওভাবে জ্বলে বলে শোনা যায় নি। 'ফিশার ইরাপ্‌শন্‌'ও নয়। দ্বীপটি সম্বন্ধে আরও নানা কিংবদন্তী আছে। তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা কষ্টকর। ওর ঐ ভয়াবহ মূর্তি দেখে কোনও জাহাজ বা নৌকোই ওর কাছে যেতে ভরসা পায় না। গেলে তার কি অবস্থা হবে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়।

লোকে বলে, দুপুর রাতে যখন সারা পৃথিবীর চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসে তখন ঐ দ্বীপের আগুনও একটু যেন স্তিমিত হয়ে আসে। আলোর সে চোখ-ঝলসানো তীব্রতাও যেন কমে আসে। ভৌতিক ব্যাপার না হলে এ-ই বা কি করে সম্ভব? যে অশরীরী আত্মারা ঐ দ্বীপ দখল করে আছে তাদেরও চোখে

হয়তো ক্ষণিকের জন্য তন্দ্রা নেমে আসে। সারা দ্বীপে পাওয়া যায় তার আভাস। কিন্তু ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবার মত বুকের পাটা কারই বা আছে?

সেবারের মত সৌমিত্র লবঙ্গ দ্বীপ ঘুরে ফিরে এল। কিন্তু সেই জ্বলন্ত দ্বীপের কথা কিছুতেই ভুলতে পারল না সে। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন জায়গায়, —যেখানে মাটির নীচে খনিজ তেল—পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়, তার আশপাশে অনেক জায়গায় এই রকম দাহ্য গ্যাসের কথা সে শুনেছে। তেলের জন্য মাটি ফুঁড়ে নল বসালে তা দিয়ে তেল না বেরিয়ে নাকি বেরোয় গ্যাস—যা আগুনের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে। কিন্তু পুরুষানুক্রমে অবিরত জ্বলতে পারে এত গ্যাস কি ঐটুকু জায়গায় থাকতে পারে? তা ছাড়া আগুন জ্বলছে অথচ ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না—এই বা কি রকম ব্যাপার! আবার নাকি মাঝে মাঝে, লোকে ঘুমিয়ে পড়লে, সে আগুনের তেজও স্তিমিত হয়ে আসে। তবে কি এটা সত্যি ভূতুড়ে কাণ্ড?

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ডাক্তার সে, এমন একটা অবিশ্বাস্য কথাই বা মেনে নেয় কি করে?

সৌমিত্র তার বন্ধু ডক্টর কিমুরাকে সমস্ত খুলে একখানা চিঠি লিখল।

ডক্টর হলেও কিমুরা কিন্তু চিকিৎসক ন'ন। তিনি একজন ভূতাত্ত্বিক। জাতে জাপানী, কিন্তু অধ্যাপনা করেন আমেরিকার কোন্ এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। একবার সৌমিত্রদের কোম্পানীর জাহাজে করে তিনি দু'-তিন মাসের জন্য সমুদ্রভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সেই সময় সৌমিত্রের সঙ্গে আলাপ এবং তা ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কিমুরা ভূতত্ত্বের অধ্যাপক হলেও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর দখল আছে খুব। আর আছে প্রবল অনুসন্ধিৎসা। কাজেই তাঁর কথাই যে সৌমিত্রের আগে মনে পড়বে এতে আর বিচিত্র কি?

জবাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল। কিমুরা লিখেছেন, মাস তিনেকের ছুটি নিন। আমাদের এখানকার জিও-ফিজিক্যাল সোসাইটির ছোট ছোট জাহাজ আছে এই সব অভিযানের জন্য। তার একটার ব্যবস্থা করেছি খরচ সমেত। হংকং-এ চলে আসুন প্লেনে। সেখানে একত্র হওয়া যাবে। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব আপনার খাকাসোজা দ্বীপের দিকে। আপনি সঙ্গে না থাকলে চলবে না।

ছোট্ট জাহাজটা। খালাসী-মাল্লা বাদ দিলে মাত্র চার-পাঁচটি লোক। অর।

আছে প্রচুর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ছোট একটি বৈজ্ঞানিক লাইব্রেরী, কাগজপত্র এটা ওটা সেটা।

থাকাসোজা দ্বীপে নেমে কিমুরা কয়েকদিন ওখানকার নানা জিনিস পরীক্ষা করে সময় কাটাতে লাগলেন। মাটি-পাথর, গাছপালা, জল ঝরণা—কোনটাই বাদ গেল না। সৌমিত্রও মাঝে মাঝে সঙ্গী হ'ল, কিন্তু এর চাইতে জাহাজের লাইব্রেরীটাই তার বেশি লোভনীয় মনে হ'ত। চিরকালই সে গ্রন্থকীট।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা কিমুরা বললেন, "এবার আমাদের ঐ জলন্ত দ্বীপের খোঁজে যেতে হবে। আজই রাত্রে। ডাঃ রায়, আপনিও চলুন। জাহাজ এখানেই থাকুক। এ তিন মাইল পথ আমরা লাইফ-বোট নিয়েই যেতে পারব। কিছু সরঞ্জাম সঙ্গে নিলেই হবে। ভয় করছে আপনার ডাঃ রায়?"

"না, ভয় কি?"—ভয়ে ভয়ে জবাব দিল সৌমিত্র—একটু ইতস্তত: করে।

সন্ধ্যার পর ছোট লাইফ-বোটটাকে জলে নামানো হ'ল। কিমুরা সৌমিত্রকে নিয়ে চেপে বসলেন নৌকোয়। ফুরফুরে জ্যোৎস্নায় শান্ত সমুদ্রের বুকে ভেসে চলল নৌকো, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল তারা জলন্ত দ্বীপের দিকে।

কিন্তু আশ্চর্য, একটু কাছে যেতেই মনে হ'ল দ্বীপটা উজ্জ্বল হয়ে আছে বটে, কিন্তু ওটা আর দাউ দাউ করে জ্বলছে না, একটা স্নিগ্ধ আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে শুধু। অশরীরীরা কি তবে বেছে বেছে আজই ঘুমে ঢুলে পড়ল!

ডক্টর কিমুরা নির্বিকার। নৌকো ধীরে ধীরে গিয়ে দ্বীপের ধারে পৌঁছল। নৌকোটা বাঁধবার জন্য কিমুরা একটা লোহার কাঁটাওয়ালা ডাণ্ডা সজোরে মাটিতে গেড়ে দিতে গেলেন, কিন্তু ডাণ্ডা মাটিতে ঢুকল না, পিছলে বেরিয়ে এল। যেমন অসম্ভব শক্ত এখানকার মাটি, তেমনি মসৃণ।

অগত্যা মাটির ওপর হিঁচড়ে টেনে আনা হ'ল নৌকো। তারপর দু'জনেই সাবধানে এগিয়ে চললেন সেই শক্ত মাটির ওপর দিয়ে। কিমুরার পিঠে ন্যাপ্-স্যাক্ ভরা যন্ত্রপাতি। কিন্তু এগোবেন কি, দাঁড়ানোই যায় না ভালো করে! পা পিছলে যাচ্ছে পদে পদে। সজোরে পায়ে ভর দিয়ে অতি কষ্টে, অতি সন্তর্পণে একটু একটু করে এগোতে লাগলেন ওঁরা। এতক্ষণে সৌমিত্র ভালো করে চেয়ে দেখল পায়ের তলায়। মাটি অসম্ভব রকম স্বচ্ছ,—প্রায় কাচের মত। কিন্তু কাচের তুলনায় অনেক—অনেক উজ্জ্বল। মাটিতে চাঁদের আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে, তাই মনে হচ্ছে মাটি থেকেই বুঝি একটা স্নিগ্ধ আলো বেরুচ্ছে।

ডক্টর কিমুরা কিন্তু চুপ করে নেই। তিনি ততক্ষণ ন্যাপস্যাক্ খুলে

অনেক কিছুই বার করে নিয়েছেন, এবং এটা ওটা দিয়ে ক্রমাগত মাটির গায়ে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনটা দিয়েই তা সম্ভব হচ্ছে না—কিছুই বসছে না মাটির ওপর। কিমুরা তখন হাতুড়ি দিয়ে মাটিতে ঘা মারতে লাগলেন; তবু মাটিতে কোনও দাগ বসল না—মনে হ'ল হাতুড়িই বুঝি ফেটে যাবে।

উত্তেজনায় কিমুরার মুখ তখন লাল হয়ে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি থলি থেকে একটা লম্বা রুল বার করলেন। কাঠের রুল নয়—শক্ত, স্বচ্ছ, ঝক্‌ঝকে দেখতে। মাটিতে একটা জায়গা ইটের মত উঁচু হয়েছিল—তারই কোণায় রুলটা রেখে একটু ঘষলেন তিনি। মোটা রুলটা কলাগাছের থোড়ের মত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল।

কিমুরা এবার একটা ছোট্ট বৈদ্যুতিক যন্ত্র বার করলেন এবং তার সাহায্যে মাটির খানিকটা অংশ পুড়িয়ে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে অতি কৌশলে একটা জারের মধ্যে সেই মাটিপোড়া ধোঁয়া সংগ্রহ করে নিলেন। তারপর আর একটা শিশি থেকে জলের মত কি একটা ওর মধ্যে ঢেলে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিতেই জারের জল ঘোলাটে সাদা হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে তা থিতিয়ে জারের তলায় সাদা সাদা গুঁড়ো পড়তে লাগল। কিমুরা ক্ষিপ্রহস্তে আরও কয়েকটা জার ঐ রকম ধোঁয়ায় ভর্তি করে ছিপি এঁটে থলিতে রেখে দিলেন, বোধ হয় পরে পরীক্ষা করবার জন্য।

এরপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত দ্বীপটাই পরীক্ষা করে দেখা হ'ল। ছোট্ট দ্বীপ, লম্বায় হয়তো এক মাইলও হবে না, চওড়ায় আরও কম। কিন্তু মাটি সর্বত্রই এক রকম,—শক্ত—স্বচ্ছ—উজ্জ্বল। কোথাও গাছপালা নেই, ঝোপঝাড় নেই—একেবারে ফাঁকা।

ঘণ্টা খানেক দ্বীপে ঘুরেফিরে ওঁরা আবার চলে এলেন জলের ধারে। তারপর নৌকো টেনে নামিয়ে ছেড়ে দিলেন আবার থাকাসোজা দ্বীপের উদ্দেশে। সারা পথ একটি কথা বললেন না কিমুরা। তাঁর হাবভাব দেখে সৌমিত্রেরও সাহস হ'ল না কিছু জিজ্ঞাসা করবার।

কথা হ'ল জাহাজে উঠে,—জাহাজ ছেড়ে দেবার পর।

কেবিনে বসে সৌমিত্র একখানা চিঠি লিখছিল, কিমুরা এসে পাশে বসলেন। তারপর শুরু করে দিলেন গল্প।

হঠাৎ সৌমিত্রর আঙুলের দিকে তাকিয়ে কিমুরা বলে উঠলেন, "আরে, আপনার হাতে ওটা কি? হীরের আংটি? আপনি তো বেশ বড়লোক! কত দাম ওটার?"

সৌমিত্র ঈষৎ গর্বের সঙ্গে বলল, "তা হাজার দুয়েক টাকা তো হবেই। আপনাদের আমেরিকার হিসেবে দু'শ-আড়াইশ' ডলার।"

"ফুঃ! ওর চেয়ে কত বড় হীরে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি!" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন কিমুরা।

"তাই নাকি? আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় খোদ কুল্লিনানখানা নিয়েই নাড়াচাড়া করেছেন!"—ঈষৎ খোঁটা দিয়ে বলল সৌমিত্র। কুল্লিনান হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরা।

"কুল্লিনান? ছ্যাঃ, কী যে বলেন আপনি! আমি যে হীরের কথা বলছি—লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি কুল্লিনান একত্র করলেও তার ধারেকাছে যায় না! পৃথিবীর সমস্ত ধনভাণ্ডার একত্র করলেও হয়তো ওর দাম কুলোবে না!'

সৌমিত্র এবার সন্দেহের দৃষ্টিতে ডক্টর কিমুরার দিকে তাকাল।

ডক্টর কিমুরা বুঝলেন। মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন তিনি।—"না ডাঃ রায়, আমি মিছে কথা বলছি না। সে হীরে আমার মত আপনিও নাড়াচাড়া করেছেন এই কয়েক ঘণ্টা আগেই। হ্যাঁ, ঐ জ্বলন্ত দ্বীপ আসলে সুবিরাট একখণ্ড হীরে ছাড়া আর কিছু নয়।"

একটু থেমে বললেন, "তা হলে খুলেই বলি আপনাকে। জ্বলন্ত দ্বীপের কাহিনী শুনে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল—আসলে যেটাকে জ্বলন্ত বলে মনে করা হচ্ছে সেটা আদৌ জ্বলন্ত নয়। কয়েক পুরুষ ধরে একই ভাবে জ্বলছে, অথচ ধোঁয়া নেই, রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে আসে আগুন—বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে এগুলি কি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়? তখন আমার সন্দেহ হ'ল, হয়তো ওখানে এমন কিছু আছে যা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং ঝক্‌মকে কোন জিনিস দিয়ে তৈরি, ঠিক আয়নার মত। আয়নার ওপর সূর্যের আলো পড়লে তা যেমন ঠিকরে আসে এবং হঠাৎ দেখলে জ্বলছে বলে মনে হয়—এও হয়তো তাই! কিন্তু কি হতে পারে?

"যাই হোক, সব রকম পরীক্ষার জন্যই প্রস্তুত হয়ে এলাম আমি। থাকাসোজা করে। জ্বলন্ত দ্বীপ থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গর তাত্ত্বিক কারণে যদি ঐ রকম হয়ে থাকে তা হলে থাকসোজাতেও তার কিছু কিছু চিহ্ন থাকতে পারে এই ভেবে আমি এখানেই প্রথম পরীক্ষা চালালাম। কি দেখলাম বলুন তো?"

সৌমিত্র জবাব দিল না, জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে রইল শুধু।

"দেখলাম"—কিমুরা বলতে লাগলেন, "দ্বীপের মধ্যে লোহার পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেশি। মাটিতে লোহা, ঝরণার জলে লোহা, এমন কি দ্বীপে কেবল সেই জাতীয় গাছেরই সমারোহ যে সব গাছ লৌহঘটিত মাটি থেকেও রস গ্রহণ করতে পারে। মাটির তলায় যে লোহা পেলাম তা শুধু লৌহঘটিত লবণ নয়—একেবারে বিশুদ্ধ খাঁটি লোহা। এত লোহা কোথা থেকে এল এই প্রবালদ্বীপে? স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন তখন আমার মনে জাগল।

"আকাশ থেকে মাঝে মাঝে উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে খসে পড়ে এ কথা নিশ্চয়ই জানেন, সাধারণ লোকে যাকে বলে তারা খসে পড়া। আসলে ওগুলো যে তারা নয়—পৃথিবীরই মত মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ সূর্যের ছোট ছোট প্রজা—এ কথাও নিশ্চয়ই জানেন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কখনও পৃথিবীর এলাকায় এসে পড়লে পৃথিবীর টানে ওগুলো ভীমবেগে নেমে আসে এবং নামবার পথে বাতাসের ঘষা লেগে জ্বলে উঠে আকাশপথেই পুড়ে নিঃশেষ হয়। যেগুলো তা হয় না সেগুলোই আমাদের পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে। এই ছিটকে-আসা উল্কাপিণ্ড সাধারণতঃ ছোট ছোট হলেও কালেভদ্রে কোন কোনটা বেশ বড়ও হয়। সাইবেরিয়ায়, ক্যালিফোর্নিয়ায়, আরিজোনা অঞ্চলে এই রকম অতিকায় উল্কাপিণ্ড পড়বার ঘটনা জানা গেছে। সাইবেরিয়ায় একটা পড়েছিল ১৯০৮ সালে। অস্বাভাবিক রকম বড় ছিল সেটা। পুড়ে যাবার পরও ওর ওজন ছিল সাড়ে তিন হাজার মণ আপনাদের দেশের হিসেবে। ঐ উল্কাটি যখন পড়ে তখন আমি ছোট, কিন্তু ওর কথা আমার বেশ মনে আছে। ঐ সময়ে ওর কয়েকশ' মাইলের মধ্যে আমি ছিলাম কিনা! ঠিক ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের সময় যেমনটা হয় তেমনি কাণ্ড হয়েছিল। একটা বনের মধ্যে পড়েছিল উল্কাটা। যেখানে পড়েছিল তার সত্তর-আশি মাইলের মধ্যে একটা গাছও রেহাই পায় নি—পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। হবেই তো, কারণ উল্কা যখন পড়ে তখন তার তলাকার বাতাসটাও যে ভয়ানক গরম হয়ে পড়ে। কাজেই কী ভীষণ চাপ আর উত্তাপের যে সৃষ্টি হয় তা বলবার নয়।

"এখন যা বলছিলাম। উল্কার উপাদানের মধ্যে লোহা থাকে সবচেয়ে বেশি। একেবারে খাঁটি লোহা। অন্য রাসায়নিক পদার্থ যা থাকে তা অনেক সময় নামবার পথেই পুড়ে গ্যাস হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। লোহাও যে খানিকটা যায় না তা নয়। কিন্তু তবু, যা বাকি থাকে, তার মধ্যে অনেক সময় শুধু ঐ লোহাটাই থেকে যায়। গ্রীন্ল্যাণ্ডের ঐ উল্কাটা নাকি শত শত বছর ধরে আশপাশের

লোকদের লোহার যোগান দিয়েছে। যাই হোক, থাকাসোজা দ্বীপে ঐ রকম লোহার আধিক্য দেখে আমার সন্দেহ হ'ল তবে কি এখানেও কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঐ রকম কোনও বিরাট উল্কাপাত হয়েছিল? নানা পরীক্ষার পর আমার সন্দেহ স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হ'ল।

"তারপরেই জ্বলন্ত দ্বীপে গিয়ে দেখলাম অদ্ভুত কাণ্ড। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! —সভ্য সমাজে বললে লোকে পাগল বলবে। কিন্তু সত্যিই তাই। আপনি হয়তো জানেন, পৃথিবীতে হীরের মত শক্ত জিনিস আর নেই। কোন জিনিস দিয়েই ওর ওপর আঁচড় কাটা যায় না। হীরের ওপর লোহা বসানো যায় না, বরঞ্চ লোহার ওপরেই হীরে দিয়ে আঁচড় কাটা যায়। আর হীরে দিয়ে যে কাচ কাটা যায় তা কে না জানে? জ্বলন্ত দ্বীপে নেমে পর পর পরীক্ষা করে এইটেই জানা গেল—ওখানকার মাটি সাধারণ মাটি নয়, একখানা আস্ত হীরের চাদর সারা দ্বীপ জুড়ে পড়ে আছে। হীরের রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে অঙ্গার—যা নাকি কয়লারও উপাদান। হীরে পোড়ালেও তাই কয়লার মত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। দ্বীপের খানিকটা মাটি,—হ্যাঁ, বুঝবার সুবিধের জন্য মাটিই বলছি ওকে,—পুড়িয়ে সেই গ্যাস আমি সংগ্রহ করেছি তা বোধ হয় আপনি দেখেছেন। আপনার চোখের সামনেই তো পরীক্ষা করে দেখলাম ঐ গ্যাস; শিশি থেকে চুনের জল মেশাতেই ঘোলাটে সাদা হয়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের গুঁড়ো পড়তে লাগল নীচে। খুব সহজ উপায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরীক্ষার এইটেই হচ্ছে প্রণালী,—বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানে, আপনি তো জানেনই। তারপর ঐ কাচের তৈরি রুলটি কেমন কলাগাছের থোড়ের মত চিরে গেল হীরের কোণা লেগে তাও তো দেখলেন। তা ছাড়া দ্বীপের ঐ ঝলমলে আলো—চাঁদের কিরণে স্নিগ্ধ স্তিমিত আলো! সূর্যের আলো পড়লে ঐ হীরকদ্বীপ যে আগুনের মতই ঝক্‌মক্ করবে, এ আর বিচিত্র কি? এতেও তো সন্দেহ-ভঞ্জন না হয়ে পারে না!"

কিমুরা চুপ করলেন। সৌমিত্র বলল, "কিন্তু এত বড় হীরের চাদর,—যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না,—হ'লই বা কি করে আর ওখানে এলই বা কি করে?"

"আসছি সে কথায়। খালি চোখে দেখে একখানা আস্ত চাদর মনে হলেও আমার জিওলজিক্যাল্ মাইক্রস্‌কোপ্ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, আসলে অসংখ্য ছোট ছোট হীরের দানা দিয়ে ওটি তৈরি। হীরের জন্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যা

বলেন তা জানলে, কি করে এই হীরে হ'ল তা আন্দাজ করা যেতে পারে। মাটির তলায় বড় বড় বনজঙ্গল যুগ যুগ থেকে পড়ে থেকে প্রবল চাপে আর উত্তাপে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। আবার এই কয়লাই অনুকূল অবস্থায় অসম্ভব উত্তাপ আর চাপ পেলে হীরের দানায় পরিণত হতে পারে। এখানেও সেই কাণ্ডই ঘটেছে মনে হয় এবং ঘটিয়েছে ঐ অতিকায় উল্কাপিণ্ড। কত বড় ছিল ঐ উল্কাপিণ্ড আর কী প্রচণ্ড ছিল তার উত্তাপ আর চাপ, তা কল্পনা করা যায় না। হয়তো আধুনিক অ্যাটম বোমার চাইতেও তা ছিল ভয়ানক। হয়তো এই দ্বীপের বনজঙ্গল আগেই কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছিল—লক্ষ লক্ষ বছর আগে। তারপর তারই ওপর হ'ল উল্কাপাত,—সেও কত লক্ষ বছর আগে কেউ জানে না। সেই তাপে আর চাপে কয়লা পরিণত হ'ল অসংখ্য হীরের দানায়, আর চাপ লেগে জমাট বেঁধে তা ছড়িয়ে রইল মাটির নীচে। তারপর কোন এক ভূমিকম্পে হয়তো সেটা ঠেলে উঠেছে ওপরে। সঙ্গে মাটি থেকে থাকলে তা ধুয়ে গেছে সমুদ্রের জলে,—ওপরে পড়ে রয়েছে হীরের চাদর। আর সূর্যের আলোয় তাই ঝল্‌মল্‌ করছে যুগ যুগ ধরে।"

"কিন্তু এত বড় সম্পদ্‌—এর সন্ধান কি কেউই পায় নি এতদিন ?"—সৌমিত্র প্রশ্ন করল।

"কি করে পাবে ? একটা গোটা দ্বীপ যদি ঐ ভাবে দিবারাত্র জ্বলতে থাকে অর্থাৎ ঝক্‌মক্‌ করতে থাকে তবে আশপাশের অশিক্ষিত লোকেরা, বা কোনও ভ্রাম্যমাণ নাবিকই ধরুন,—তা দেখলে ভয়ই পাবে, ওর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে নিশ্চয়ই যাবে না। প্রথমেই তাদের সন্দেহ হবে ওটা কোন ভৌতিক ব্যাপার। তারপর তার সম্বন্ধে নানা গাল-গল্প বানাতেও বেশি দেরি হবে না। এ ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। পুরুষানুক্রমে ঐ সব গল্প শুনে অতি বড় সাহসীরাও দ্বীপে এসে পরীক্ষা করবার সুযোগ পায় নি।"

সৌমিত্র অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। কিমুরা বললেন, "যাই হোক, খবরটা আপাততঃ খুব গোপন রাখতে হবে। আমি আর আপনি ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কেউ জানে না। দেশে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা যাবে এই হীরকদ্বীপ মানুষের কাজে লাগানো যায় কিনা।"

এরপর যে সব ঘটনা ঘটল তা অল্প কথায় বলে শেষ করি। ডক্টর কিমুরা ও সৌমিত্রের চেষ্টায় বিজ্ঞানী-মহলে এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ খুব গোপনীয় ভাবেই

পরিবেশন করা হ'ল। আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্য নিয়ে ওটা রক্ষারও ব্যবস্থা করা হ'ল—কোন দেশের সরকার যাতে ওটা দাবী না করে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য আপাততঃ ওটাকে ছেড়ে দেন—চাপ দিয়ে সে ব্যবস্থাও করা হ'ল। জিও-ফিজিক্যাল সোসাইটিই গবেষণার ভার নিলেন। ডক্টর কিমুরার নেতৃত্বে পাঁচখানি জাহাজ-বোঝাই যন্ত্রপাতি আর বিশেষজ্ঞ নিয়ে আবার জ্বলন্ত দ্বীপ অভিযানের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা।

যথা সময়ে জাহাজ গিয়ে হাজির হ'ল নির্দিষ্ট স্থানে। কিন্তু কোথায় সেই জ্বলন্ত দ্বীপ? তার জায়গায় টলমল করছে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ! রাতারাতি কোথায় হারিয়ে গেল সেই হীরার দ্বীপ? সমুদ্রে ডুবে গেল? না হাওয়ায় মিলিয়ে গেল আকাশে? এমন কি, তিন মাইল দূরের খাকাসোজা দ্বীপেরও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ব্যাপারটা বোঝা গেল কয়েক দিন পরেই। এই অঞ্চলটিই মার্কিন সরকার বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের অ্যাটমিক অর্থাৎ পারমাণবিক পরীক্ষার জন্য। তাঁরা তো কল্পনাও করতে পারেন নি যে ঠিক এই জায়গাটাতেই পৃথিবীর এত বড় একটা রহস্য এ যাবৎ অনুদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে আছে। লোকালয়-বিহীন নিরিবিলি কয়েকটা প্রবালদ্বীপ পড়ে আছে সাগরের বুকে, কারোই আওতায় নয়। কার তা নিয়ে মাথাব্যথা হতে পারে? আর তাই এইখানেই পড়েছে তাঁদের পারমাণবিক পরীক্ষার হাইড্রোজেন বোমা। বোমার প্রচণ্ড তাপে হীরকদ্বীপের সমস্ত হীরে হয়তো পুড়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মহাশূন্যে, আর তার প্রচণ্ড চাপে এই দ্বীপ তো বটেই, আশপাশের ছোটখাট সমস্ত প্রবালদ্বীপ ভেঙ্গে, ফেটে, চৌচির হয়ে মিলিয়ে গেছে সাগরের তলায়।

ফুটোস্কোপ

সকালবেলা কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা খবরের দিকে চোখ পড়ায় চমকে উঠলাম। খবরটা এই রকম ঃ

নতুন ভূমিকায় ডাক্তার চট্টখণ্ডী

(নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট)

এককালের বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডক্টর সুভ্রাট চট্টখণ্ডী, যিনি নাকি কিছুদিন আগে মানসিক স্থিরতা হারিয়ে ফেলেছেন বলে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাকে সম্প্রতি এক নতুন ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। জন কয়েক সমাজবিরোধী গুণ্ডাশ্রেণীর যুবকের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এই যুবকদের যখন তখন তার তথাকথিত 'চেম্বারে' হাজির হতে দেখা যায় এবং তিনি নাকি তাদের প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করে থাকেন। এই অসম আঁতাতে কোন্ পক্ষের ভূমিকা বেশি তা যদিও জানা যায় নি কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় এটিকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখবেন। আমরা মহামান্য সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

সুভ্রাট আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। একই স্কুলে সেই নীচের ক্লাস থেকে শুরু করে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে পড়েছি, একসঙ্গে খেলেছি, একসঙ্গে বেড়িয়েছি, তর্কাতর্কি করেছি, সময় বিশেষে ঝগড়াও যে করি নি তা নয়; কিন্তু ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব চিরদিনই অটুট ছিল। অসম্ভব বুদ্ধিমান্ আর অসম্ভব তুখোড় ছেলে। তেমনি অসম্ভব খামখেয়ালীও বলা চলে; সেই ছেলেবেলা থেকেই ওর ছোট্ট মাথায় যে কত রকম উদ্ভট কল্পনা, কত রকম উদ্ভট প্ল্যান আর কত রকম উদ্ভট চিন্তা গিজগিজ করত তা নিয়ে আমরা কত হাসাহাসিই না করেছি! কিন্তু ও তাতে ভ্রূক্ষেপ করাও দরকার মনে করত না।

তারপর ম্যাট্রিক পাশ করলাম, কলেজে উঠলাম। আই. এস্-সি. পাশ করে ও ডাক্তারী পড়ার জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হ'ল, আমি আই. এ. পাশ করে ভালো করে পড়াশোনা করব ভেবে চলে গেলাম লখ্নৌ। সেখানে আমার মামা ইতিহাসের অধ্যাপক। ঐতিহাসিক হবার সাধ আমারও।

দেখাসাক্ষাৎ কমে এল। তারপর ডাক্তারী পাশ করে ও চলে গেল বিলেত, আমি ইতিহাসের একটা অধ্যাপকের কাজ জুটিয়ে নিয়ে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত

মহিমা খুঁজে বার করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। ভাঙ্গা মূর্তি আর শিলালিপির খোঁজে চষে বেড়াতে লাগলাম এখানে সেখানে। দেখাসাক্ষাতের আর ফুরসৎই রইল না।

দেখা হ'ল বহু বছর পরে। তখন আমরা দু'জনেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে কিছুটা নাম করেছি। তবে সুভ্রাটের তুলনায় আমার নাম যে কিছুই নয় তা বুঝতে কষ্ট হ'ল না। সুভ্রাট তখন শহরের একজন প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রচিকিৎসক। লোকে বলত ও ছুরি ধরলে যমদূতরাও পালাতে পথ পায় না। কিন্তু হলে কি হবে, ওর সেই ছেলেবেলাকার খামখেয়ালিপনা মোটেই যায় নি, বরং যেন বেড়েই চলছিল। অস্ত্রচিকিৎসার নাম করে সে মাঝে মাঝে এমন সব বিপজ্জনক কাজ করে বসত যে রোগীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত। শেষে ওর নামে নানা অভিযোগ শোনা যেতে লাগল। ওর নাকি একটু একটু মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যাকে আমরা বলি মানসিক ভারসাম্য- তা নাকি ও ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে।

এরকম লোককে, আর যাই হোক, চিকিৎসার মতো জীবন-মরণ সমস্যার কাজে রাখা নিরাপদ নয়। কর্তৃপক্ষ তাই ওকে সরকারী কাজ থেকে ইস্তফা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন এবং শেষে, তিতিবিরক্ত হয়ে, ওই একদিন ধুস্ বলে পদত্যাগ পত্র পেশ করে দিল।

এর মধ্যে ওর সঙ্গে দু'-একবারের বেশি দেখা হয় নি। আজ কাগজ পড়ে ভাবলাম, সত্যি, ব্যাপারটা জেনে আসা উচিত। বাল্যবন্ধু হিসেবে আমারও কিছু কর্তব্য আছে তো!

বালীগঞ্জে সুভ্রাটের বিরাট বাড়ী। সামনের ঘরেই কাউণ্টারের ভেতর নার্সের পোশাক পরা একটি মেয়ে বসে আছে। যেতেই সে একটা স্লিপ এগিয়ে দিল নামটা লিখে দেবার জন্য এবং নাম লেখা হলেই একটি খাকি-জামা-পরা রোগা গোছের লোক সেটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

মিনিট খানেক পরেই সে ফিরে এল। সাহেব ডাকছেন।

সুভ্রাটের ঘরে তখন দু'-তিনটি তথাকথিত তরুণ বসে ছিল। তাদের চেহারা দেখেই মনে হ'ল তবে তো খবরের কাগজওয়ালারা বানিয়ে কিছু লেখে নি। তিনটি ছেলেই চেহারায়, পোশাক-আশাকে যাদের আমরা পাড়ার মাস্তান বলে থাকি— ঠিক তাই। তাদের সামনে খাবারের প্লেট সাজানো, পাশে চা-ভর্তি

পেয়ালা। সুভ্রাট তাদের সঙ্গে যেমন গদগদ হাসিমুখে কথা বলছিল তাতে মনে হ'ল ওদের সঙ্গে তার ভারি খাতির।

ঢুকতেই, আমার দিকে মাথা নেড়ে সুভ্রাট ইঙ্গিতে একটা চেম্বার দেখিয়ে দিল, তারপর মাস্তানদের সঙ্গে ফের তার কথাবার্তা চলতে লাগল।

আমার ধৈর্য যখন প্রায় শেষ সীমায় তখন ছোকরা তিনটি উঠে পড়ল। সুভ্রাট উঠে দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এল।

এইবার সে আমার সঙ্গে কথা বলার ফুরসৎ পেল।

"তারপর ? হঠাৎ তুই যে! কি মনে করে ?"

"এলাম তোদের হালচাল দেখতে। কাগজে লিখেছে কিনা!"

"কাগজ!"—সুভ্রাট অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়ে তুলল।—"নো ওয়ার্ক, ফ্রাই খই : নেই কাজ, খই ভাজ। খই-এর ইংরেজি কি রে ? জানি নে বাবা!"

"হ্যাঁ, খই ভেজে যে অন্যায় করে নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। লোকে তোকে পাগলা ডাক্তার বলে, সেটা সহ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে তোকে এই সব মাস্তানদের সাকরেদ বলে ভাবা যায় না।"

সুভ্রাট কথার জবাব দিল না। মিটিমিটি হাসতে হাসতে শুধু বলল, "চা খাবি ?"

"না।"

"চা খাবি না ? তবে কফিই আনতে বলি।"

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই সে চাকরকে ডেকে দু' কাপ কফি পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে বলল, "চল্, আমার চেম্বারে গিয়ে বসি।"

"চেম্বারে কেন ?',

"চল্ই না।"

চেম্বার দেখে মনে হ'ল ওটাকে চেম্বার না বলে কোনও আধুনিক বিজ্ঞানীর সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী বললেই ঠিক বলা হয়। চারদিকে নানা রকম যন্ত্রপাতি সাজানো। দেয়ালে নানা রকম চার্ট, নক্সা ইত্যাদি ঝুলছে। একপাশে কতকগুলো শিশিবোতল, ইন্‌জেক্‌শনের সরঞ্জাম, আরও নানারকম সার্জারির অস্ত্রশস্ত্র। হ্যাঁ, অস্ত্রশস্ত্রই বলা চলে যন্ত্রপাতি না বলে। শুধু রোগের সঙ্গে নয়, রোগীর সঙ্গেও যুদ্ধ করা চলে ও দিয়ে।

একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রও দেখলাম। অনেকটা মাইক্রস্কোপের আর

টেলিস্কোপের মাঝামাঝি দেখতে। ভারি কৌতূহল হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, "এট আবার কি ?"

সুভ্রাট মুচকি হেসে বলল, "ফুটোস্কোপ।"

"তার মানে ?"

"কেন, পড়িস নি সুকুমার রায়ের কবিতা ?

"আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আর দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।"

"তা তো পড়েছি, কিন্তু…"

"কিন্তু নয়, সত্যিই এটা ফুটোস্কোপ। এর সাহায্যে আমি মানুষের মাথার খুলির ভেতরটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাই। কোথায় আছে মোটর এরিয়া, যা নাকি সেরিব্রাম—বাংলায় যার নাম দেওয়া হয়েছে গুরুমস্তিষ্ক,—তার মাঝ বরাবর একটা সরু নালীর সামনে বসানো, আছে, কোথায় আছে সেন্‌সরী এরিয়া যা নাকি আছে ওর পেছন দিকে। আর, তুই তো জানিস, আমাদের সব নার্ভ অর্থাৎ স্নায়ুর আসল কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক বা মগজ। আমাদের শরীরের কোথায় কি কাজ হবে, কি কাজ হচ্ছে এবং কি কাজ করতে হবে সবই ঠিক করে দিচ্ছে এই মগজ।"

বাধা দিয়ে বললাম, "না রে বাবা, ও-সবের কোন খবর-টবর আমি রাখি নে।"

"তা রাখবি কেন ? যত সব অকাজ নিয়ে পড়ে আছিস ! সেই যে কবে কান্তকবি লিখে গিয়েছিলেন, গৌতম সূত্রে আর রেশম সূত্রে প্রভেদ কি কি—তাই নিয়েই পড়ে থাক্। তারপর শিলালিপি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একদিন দেখবি তুইও একটা জ্যান্ত পাথর হয়ে গেছিস। আজকের দিনের শেষ কথা হচ্ছে বিজ্ঞান। কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ! কোথায় তা নিয়ে মাথা ঘামাবি, তা না যত্ত সব…"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, সুভ্রাট থামিয়ে দিয়ে বলল, "যা যা, মেলা বাজে বকিস না। নে, কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আগে খেয়ে নে। মগজটা তাজা তাজা লাগবে।"

কফি খেয়ে সত্যি মগজ না হলেও মেজাজটা একটু তাজা তাজা লাগছিল। বললাম, "এ অদ্ভুত যন্ত্র কোথায় পেলি ?"

"পেয়েছি কি আর ? মাথা খাটিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছি। দশ বছর লেগেছে এটি বার করতে।" বলেই সুভ্রাট আবার সুর করে আওড়াতে লাগল :

"কোন্ দিকে বুদ্ধিটা খেলে, কোন্ দিকে থেকে যায় চাপা,
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠক্‌ঠকে ফাঁপা।"

নাঃ; আমার আবার মনে হ'ল কাগজওয়ালারা বাজে কথা লেখবার লোক নয়। এত বড় ডাক্তারটা সত্যি পাগলা হয়ে গেছে।

অগত্যা অন্য কথা পাড়লাম। বন্ধুবান্ধবদের কে কোথায় আছে, কে কি করছে- এই সব মামুলি গল্প সেরে খানিকক্ষণ বাদে উঠে এলাম।

কয়েকদিন পরে কাগজে আবার দেখি একটা জোর খবর। না, সুভ্রাট সম্বন্ধে নয়। ও নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না। খবরটা জো ডিম্বো সম্বন্ধে। জো ডিম্বো একজন নিগ্রো কুস্তিগীর। ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ন না হলেও তারই সমগোত্রীয়। পৃথিবীর নানা দেশের কুস্তিগীরদের ঘায়েল করে সে নাকি এবার কলকাতায় আসছে। এদেশের বাঘা বাঘা কুস্তিগীরদের সঙ্গে লড়বে সে। লম্বায় সাত ফুট, ওজনে প্রায় পাঁচ মণ। অতিকায় এই নর-দানবটির ছবি দেখেছি, কিন্তু তার কুস্তি যে কখনও দেখার সুযোগ হবে তা ভাবি নি। নিজে কুস্তিগীর না হলেও কুস্তি আমার চিরদিনের প্রিয় খেলা। ছেলেবেলায় গামা, গুংগা, ইমাম বক্স, গোবর বাবু—এঁদের কুস্তি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল; সেই সূত্রে ওটা একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং সে ধরনের বড় কোনও কুস্তিগীরের লড়াই দেখার সৌভাগ্য হয় নি। জো ডিম্বো আসছে শুনে তাই ঠিক করলাম, যে ভাবেই হোক ওর লড়াই দেখতেই হবে।

তবে শুনেছি লোকটা নাকি ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। কুস্তিটাকে খেলা হিসাবে ও দেখে না,—দেখে সত্যিকার লড়াই,—যাকে আমরা বলি দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা ডুয়েল,—সেই চোখে। অর্থাৎ লড়াই-এর ফলে যদি বিপক্ষের প্রাণহানি ঘটে যায় তা হলেও কোনও পরোয়া করে না। একবার সত্যি তাই হয়েছিল। যার সঙ্গে ওর কুস্তি হ'ল লড়াইএর আধঘন্টা পরেই সে মারা গেল। এ নিয়ে জো ডিম্বো একটু মুশ্‌কিলেই পড়েছিল। কি ভাবে জানি না, শেষ পর্যন্ত মৃত লোকটির হার্ট খারাপ ছিল এই রকম একটা, যাকে বলে 'বেনিফিট্ অব্ ডাউট'-এর অজুহাতে ও ছাড়া পায়। আর একবার কুস্তি লড়তে গিয়ে ও প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল বলেও শুনেছি। তা সত্ত্বেও জো ডিম্বোর লড়াই যে একটা দেখবার মত জিনিস হবে তাতে সন্দেহ নেই।

হু-হু করে টিকিট বিক্রি হতে লাগল। পাঁচ টাকা দশ টাকার টিকিট লাইন দিয়ে এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আমি বহু কষ্টে পঁচিশ টাকা

দিয়ে একটা দশ টাকার টিকিট যোগাড় করলাম—তাও খেলার এক সপ্তাহ আগে।

কিন্তু খেলার তিনদিন আগে আবার এক বিস্ময়কর খবর বেরোল, জো ডিম্বোকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতায় একটা নামী হোটেলে ও উঠেছিল এবং নিত্যকার অভ্যাসমত রাত্রে একটু বেশি মদটদ খেয়ে শুয়েছিল। হয়তো সেদিনকার মদের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে থাকবে। ভোর রাত্রে উঠে দেখা গেল ওর ঘর খোলা। পালোয়ান বাবাজীর নো পাত্তা। কোথায় গেল? কোথায় গেল? খোঁজ খোঁজ খোঁজ। মদের ঝোঁকে কোথাও বেরিয়ে গেল? নাকি কেউ ওকে কিড্ন্যাপ্—কিনা অপহরণ করল? কিন্তু অত বড় পালোয়ানটাকে কিড্ন্যাপ করা তো সহজ কথা নয়—যদি না লোকটা একদম বেহুঁশ হয়ে থাকে।

এদিকে খেলার টিকিট সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। পুলিশ চারদিক্ চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু না, কোন খোঁজ নেই জো ডিম্বোর!

অবশেষে খেলার নির্দিষ্ট দিন ভোর বেলা ওকে আবিষ্কার করা গেল। গঙ্গার ধারে একটা গাছের নীচে বসে আপন মনে চুরুট ফুঁকছিলেন বাবু! ওর ঐ মিশ্‌মিশে কালো অতিকায় চেহারা দেখেই লোকে সন্দেহ করেছিল। শেষে পুলিশে খবর দিতে তারা ছুটে এসে ওকে সনাক্ত করে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে এল। আর, আশ্চর্য, ও বেশ খোশমেজাজে হাসতে হাসতেই তাদের সঙ্গে উঠে এল। সেদিনই সন্ধ্যায় ওর খেলা।

হাজার হাজার দর্শকের সঙ্গে আমিও বসে আছি। যথা সময়ে জো ডিম্বো মঞ্চে এসে ঢুকল। ওর সঙ্গে প্রথম লড়বে বেনারসের বিখ্যাত পালোয়ান শিউশরণ তেওয়ারী। মস্ত বড় নামী কুস্তিগীর। একটু থলথলে হলেও মোটামুটি বেশ মজবুত চেহারা। সমস্ত মাথা কামানো, শুধু মাঝখানে, ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপর একটিপ নস্যির মত ছোট্ট একটুকু চুলের আভাস। সেটি ওর টিকি, যা ওকে অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু সে টিকি ধরে কেউ টানবে এমন উপায় নেই।

কিন্তু জো ডিম্বোর চেহারা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। এতদিন শুনে এসেছি এই লোকটি শুধু চেহারায়ই কুৎসিত নয়,—স্বভাবেও অতি বদ্‌মেজাজী এবং তার চেয়েও বেশি হিংস্র। কিন্তু এখন দেখি একেবারে উল্টো। না, চেহারা কুৎসিতই, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মেজাজটা ভীষণ আমুদে। কথায় কথায় হেসে উঠছে,

পারলে যেন গড়িয়ে পড়ে। শিউশরণকে মঞ্চে উঠতে দেখেই ও পরম আনন্দে এগিয়ে গিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ড শেক্ করবার জন্য।

যথা সময়ে ঘণ্টা বাজল, হুইস্‌ল্ পড়ল, শুরু হ'ল কুস্তি। কিন্তু এ কি! কুস্তি লড়বে কে? জো ডিম্বো হেসেই কুল পায় না—ফুর্তিতে এতই ডগোমগো! শিউশরণ যত তেড়ে আসে ও ততই পিছিয়ে যায় আর হাত নেড়ে এমন ভাব দেখায় যাকে পুঁথির ভাষায় বললে হয়তো বলা যায়—"না ভাই, আমাকে লড়তে ব'লো না। সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না। তার চেয়ে এস, দু'জনে গলাগলি করে বসে একটু রসের গান গাই।"

দেখে হাজার হাজার দর্শক সবাই থ!

এ অবস্থায় যা হবার তাই হ'ল। শিউশরণ লড়বেই। জিতলে সে একটা খুব মোটা টাকা পাবে। তাই মিনিট খানেকের মধ্যেই সে জো ডিম্বোকে তুলে চিৎ করে দিল। অত বড় ভারী দেহটা তুলতে যতটা সময় লাগে ততটুকুই সময় লাগল তার। আর মজা, চিৎ হয়েও জো ডিম্বোর লজ্জা নেই। তখনও সে বোকার মত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

হঠাৎ একটু দূরে আর একটা অট্টহাসি শুনে চমকে ফিরে দেখি আমাদের অদূরে বসে আছে সুভ্রাট। হেসে গড়িয়ে পড়ছে সেও। আর তার পাশে? সেই তিন মাস্তান। তারাও সমানে হাসছে। সুভ্রাটেরও তা হলে এ সব খেলা দেখার শখ আছে। কিন্তু সঙ্গে ঐ সব সঙ্গী কেন?

যাই হোক, মল্লযুদ্ধের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা কখনও শোনা যায় নি; আমার না হয় পঁচিশটা টাকা জলে গেল, কিন্তু জো ডিম্বোকে যারা এনেছিল বহু টাকা খরচ করে তারা তো রাম খাপ্পা হবেই। সেই রাত্রেই তাকে দমদম্ এয়ার পোর্টে নিয়ে গিয়ে প্লেনে রওনা করিয়ে দিয়ে আসা হ'ল। প্লেনে উঠেও নাকি জো ডিম্বোর মনে কোন রকম অনুশোচনা দেখা যায় নি, সে নাকি তেমনি ফুর্তির সঙ্গেই শিস দিতে দিতে গিয়ে বসেছিল তার সিটে।

এই ঘটনার পর মাস খানেক কেটে গেছে, লোকে আস্তে আস্তে সব ভুলে গেছে, এমন সময় আবার কাগজে দেখা গেল এক রগ্‌রগে বিজ্ঞাপন। কি, না কলম্বাস্ কলকাতায় আসছে। কে কলম্বাস? ইতিহাসের বিখ্যাত আবিষ্কারক ক্রিস্টোফর কলম্বাস? তিনি তো কয়েক শ' বছর আগের লোক! আরে না না, ক্রিস্টোফর নয়, গঞ্জালেস কলম্বাস—যে নাকি এখন স্পেনের সবচেয়ে নামকরা বুল্ ফাইটার।

বুল্ ফাইট্—ক্ষেপা ষাঁড়ের সামনে মানুষের একা দাঁড়িয়ে হাতাহাতি লড়াই স্পেনের একটি জাতীয় খেলা—বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং এখনও চলে।

বুল্ ফাইটের গল্প অনেক পড়েছি বইয়ে কিন্তু এদেশে ও জিনিস কখনও চাক্ষুষ দেখি নি। কলম্বাস্ সেই খেলা দেখাবে কলকাতার স্টেডিয়ামে। সত্যি এটা একটা রগ্‌রগে খবরই বটে!

আবার সেই টিকিটের জন্যে লাইন। কিন্তু এবারে টিকিট যোগাড় করতে আরও কষ্ট হ'ল। অনেক ধরাধরি করে শেষে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে একটা কম দামী টিকিট যোগাড় হ'ল। তাই সই।

আশ্চর্য খেলা! কল্পনাই করা যায় না। স্টেডিয়ামের একদিকে একটা বিরাট ষাঁড় দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে মাটিতে শিং ঘষছে আর নাক দিয়ে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করছে। আমরা দূরে বসেও তা বেশ শুনতে পাচ্ছি। ষাঁড়টার অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে কলম্বাস। তার কোমরের কাছে একটা টুকটুকে লাল তোয়ালে জড়ানো। একহাতে একটা চটের বস্তা, অন্য হাতে একটা বড় ছোরা।

শুনেছি লাল রং দেখলে গরু-মোষরা দারুণ ক্ষেপে যায়। এক্ষেত্রেও তাই দেখলাম। হঠাৎ ষাঁড়টা তীরবেগে ছুটে এসে আক্রমণ করল কলম্বাসকে। কলম্বাস চটের বস্তাটা ষাঁড়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে চকিতে পাশে ঘুরে গেল। ষাঁড়টা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল মাটিতে। কিন্তু না, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়েছে সে।' কলম্বাস কিন্তু এই ফাঁকে আবার অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর ষাঁড়টার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বস্তাটা বাগিয়ে ধরে।

ষাঁড় আবার তেড়ে এল, আবার সেই রকম পাশ কাটিয়ে ওকে এড়িয়ে গেল কলম্বাস—চটের থলিটা এগিয়ে দিয়ে। আবার হুড়মুড় খেয়ে গড়িয়ে পড়ল ষাঁড়।

এই রকম চলল খানিকক্ষণ। মনে হ'ল ষাঁড়টা এবার বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবু শেষ বারের মত সে আর একবার তেড়ে এল, কিন্তু এবার তার গতিতে ক্ষিপ্রতা যেন কম। কলম্বাস সে সুযোগ নিতে দেরি করল না। ষাঁড়টা চটের থলির উপর এসে পড়তেই সে ঘ্যাঁচ করে ছোরাটা তার পিঠে আমূল বসিয়ে দিল। ষাঁড়টা টলতে টলতে বসে পড়ল। তখনও মরে নি, রক্তের ধারা দেখে বোঝা গেল সে আর সহজে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

একটা পা শায়িত ষাঁড়ের গায়ে বাড়িয়ে দিয়ে কলম্বাস কোমরের লাল তোয়ালেটা খুলে নিশানের মত দোলাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চটাপট্ হাততালি আর বিপুল হর্ষধ্বনিতে সমস্ত স্টেডিয়াম যেন ফেটে পড়ল।

চেঁচামেচি, হৈ-চৈ থামলে, সবাই অবাক্ হয়ে দেখে দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলছে। তাকিয়ে দেখি আর কেউ নয়, স্বয়ং ডাক্তার সুভ্রাট চট্টখণ্ডী। এখানেও সে হাজির।

তারপর যা ঘটল তা অভাবনীয়। সমস্ত জনতাকে চমকিত করে সুভ্রাট ঘোষণা করল, এ রকম বুল্ ফাইট সেও দেখাতে পারে। যে কোনো পাগলা ষাঁড়ের সঙ্গে সেও লড়তে প্রস্তুত। এবং আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে এ খেলা সেও দেখাবে। এই স্টেডিয়ামেই।

যারা ওকে চিনত তারা হেসে উড়িয়ে দিল—পাগলা ডাক্তারের এ আর এক পাগলামি ভেবে। কিন্তু কলম্বাস গম্ভীরভাবে বলল, "বেশ, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। যদি পারেন, আমার সমস্ত পারিশ্রমিকের টাকা ফেরত দিয়ে দেব।"

"বেশ, আমি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। কোন্ ষাঁড়টার সঙ্গে লড়তে হবে আপনিই না হয় ঠিক করে দিন।"

একটা খোঁয়াড়ে অনেকগুলি অতিকায় জোয়ান ষাঁড় আটকানো ছিল। কলম্বাস এগিয়ে গিয়ে সবচেয়ে বদ্‌রাগী যেটা সেটাকে দেখিয়ে বলল, "এইটির সঙ্গে আপনি লড়বেন। কেবল ঐ ষাঁড়টিরই ঘাড়ের কাছে কালো ছাপ রয়েছে। কাজেই ওকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না।"

এক সপ্তাহ পরের কথা। স্টেডিয়াম সেদিন লোকে লোকারণ্য। আগের দিনের চেয়েও ভিড় বেশি। এবার আর আমি টিকিট সংগ্রহ করতে পারি নি। কিন্তু সুভ্রাটই একটা কম্প্লিমেন্টারি টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে।

সন্ধ্যার দিকে সুভ্রাট সেজেগুজে স্টেডিয়ামে ঢুকল। ইচ্ছে করেই সে আজ একটা কোঁচানো ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে এসেছে। তবে কোমরে কলম্বাসের মতই একটা লাল তোয়ালে জড়িয়েছে—হয়তো ষাঁড়টাকে উত্তেজিত করার জন্য। তবে হাতে তার ছোরাটোরা কিছু নেই—আছে শুধু একটা ছোট চটের বস্তা। বাজার-করা থলির মতই ছোট সেটা। কলম্বাসের বস্তার চাইতে অনেক ছোট তো বটেই!

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছি। হ্যাঁ, সেই ঘাড়ের কাছে কালো ছাপ ষাঁড়টাই তো!—সবচেয়ে বদ্‌মেজাজী বলে যেটাকে সবাই জানে—সেটাই তো রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে সুভ্রাটের মুখোমুখি।

কিন্তু কই, সুভ্রাটকে আক্রমণের জন্য তো তেড়ে আসছে না ষাঁড়টা! বরঞ্চ সুভ্রাটই পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে!

একটু পরে আরো আশ্চর্য কাণ্ড! সুভ্রাট বাঁ-হাতে চটের থলিটা পাশে ঝুলিয়ে রেখে ষাঁড়টার ঘাড়ে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে শুরু করল। আর ষাঁড়টা, গোঁয়াতুর্মি করা দূরে থাক, পোষা কুকুরের মত মাথা নীচু করে যেন ওর আদর কাড়তে লাগল।

সুভ্রাট চেঁচিয়ে বলল, "এই, লড়বি না? আয়! আয়!"

কিন্তু ষাঁড় নির্বিকার। কোথায় গেছে তার বদ্‌মেজাজ! একেবারে লজ্জানত নতুন বৌয়ের মতো মাথা নীচু করে সেই যে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই!

"দেখুন, ষাঁড় বলছে ও লড়াই করবে না। তার মানে ও স্বেচ্ছায় হার স্বীকার করে নিচ্ছে, তাই না? তা আমি আর কি করব?"—ষাঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাসতে হাসতে ঘোষণা করল সুভ্রাট। —"একটা বরঞ্চ ফটো তুলে নিন আপনারা। আর মিষ্টার কলম্বাস! লড়াই যখন হ'লই না তখন আপনার পারিশ্রমিকের টাকা আর ফেরত দেবার প্রশ্নই উঠছে না। ও টাকা আপনারই প্রাপ্য, ও আপনি নিয়ে যান।"

স্টেডিয়াম সুদ্ধ লোক দেখেশুনে থ!

পরদিন ভোর না হতেই ছুটলাম সুভ্রাটের কাছে। এ অদ্ভুত রহস্যের সমাধান চাই-ই। আর, একমাত্র সুভ্রাটই হয়তো পারে তা করতে।

সুভ্রাট আজও সেই মাস্তানদের নিয়ে বসে বসে কফি খাচ্ছিল, হ্যাঁ, চেম্বারেই। আমায় দেখে আর এক পেয়ালার হুকুম দিয়ে বলল, "বোস্। জানতাম তুই আজ আসবি।"

ছোকরা তিনটি হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল।—"আজ আসি তবে, স্যার!"

"হ্যাঁ, এস।"

ওরা চলে গেলে আর ভণিতা না করে বললাম, "জানিস নিশ্চয়ই কেন এসেছি। বাজে-কথা না বলে ভালো করে বুঝিয়ে দে তো রহস্যটা।"

সুভ্রাট সস্নেহে সেদিনকার সেই যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বলল, "সব রহস্যের মূলে রয়েছে এই যন্ত্রটি—যার নাম আমি আদর করে দিয়েছি ফুটোস্কোপ। সব যন্ত্রপাতিরই ইংরেজি নাম হবে কেন, দু'-একটার দিশী নামও থাকুক। বিশেষ করে অত বড় গুণী লোকের দেওয়া নাম।"

"তার মানে? ও সব হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলবি কি-না বল্!"

"বলব বৈকি! আগে একটু জিরিয়ে নে। বড্ড উত্তেজিত মনে হচ্ছে তোকে।"

"না আমার সবুর সইছে না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, বলছি। তবে সংক্ষেপে বলব কিন্তু।"

তার পর সুভ্রাট সংক্ষেপেই সমস্ত ব্যাপারটা এইভাবে বুঝিয়ে দিল :

"তুই হয়তো শুনে থাকবি, বহুদিন থেকে এই মগজ নিয়ে আমি রিসার্চ্ করছি। আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে মগজ বা মস্তিষ্ক। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র বলা যায় এটিকে। সেদিনই তোকে বলেছিলাম আমাদের দেহের কোথায় কি কাজ হবে, কি কাজ হচ্ছে এবং কি কাজ করতে হবে সবই ঠিক করে এই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে দু'টি ভাগ,—একটিকে বলা হয় সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক, আর একটিকে বলে সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্কের পেছন দিকে এমন এক-একটা জায়গা আছে যা আমাদের এক-একটা ইন্দ্রিয়ের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, কোনটা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের দৃষ্টি, কোনটা শ্রবণশক্তি, কোনটা ঘ্রাণশক্তি, কোনটা বাক্‌শক্তি—এই রকম আর কি! ঐ রকম আমাদের ক্রোধ, হিংসা, আনন্দ, মনের স্ফূর্তি, স্মৃতিশক্তি—এ সবও কি মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্রিত করে না? নিশ্চয়ই করে এবং তাদের জন্যও গুরুমস্তিষ্কে এক-একটা নির্দিষ্ট জায়গা বাছাই করা আছে।

"মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করতে করতে আমার মনে হয়েছিল যদি ঐ জায়গাগুলোকে ঠিক ঠিক খুঁজে বার করতে পারি তা হলে ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে এক-একটা জায়গাকে ইচ্ছেমত নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারলে তার কাজগুলোকেও সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে আমাদের ইচ্ছেমত। এখানে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে এই যন্ত্রটি যার নাম আমি আদর করে রেখেছি 'ফুটোস্কোপ'। সুকুমার রায়ের ঐ কবিতাটা আমার খুব প্রিয় কিনা! বিলেতে থাকতে আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু—ডক্টর কিউইউ, যে ছিল ইউনিভার্সিটির অপ্‌টিক ফিজিক্সের অধ্যাপক—এই যন্ত্র তৈরির কাজে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। যাই হোক, এই যন্ত্রের সাহায্যে মগজের ভিতরকার নানা অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতই খুব বড় করে দেখা যায়। (এখানে সুভ্রাট আমাকে নিকল্ প্রিজ্‌ম্, ক্যাথোড টিউব, কনকেভ-কন্‌ভেক্স ইত্যাদি নানা রকম লেন্স এবং আরও কি কি সব বিদ্‌ঘুটে বৈজ্ঞানিক তথ্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যা আমি বুঝি নি। কাজেই বোঝাবারও চেষ্টা করব না।)

"যাই হোক, এই ফুটোস্কোপ যন্ত্রটির সাহায্যে এবং ক্রমাগত পরীক্ষা করে করে আমি মস্তিষ্কের ঐ সব বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো মোটামুটি সনাক্ত করে

ফেলেছি এবং কি ভাবে ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিয়ে ও সব জায়গাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় তাও বার করেছি।

"প্রথমে হাসপাতালে রোগীদের ওপর এই পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু খুলে প্রকাশ না করায় কেউ আমার উদ্দেশ্য ধরতে পারে নি. ফলে 'পাগলা ডাক্তার' এই খেতাব নিয়ে আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হ'ল।

"কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়েও আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি নি। বাড়িতেই একটা ল্যাবরেটরী গোছের বানিয়ে নিয়ে আমি আমার গবেষণার কাজ আরও ভালো করে চালিয়ে যাচ্ছিলাম! কিন্তু সমস্যা হ'ল পরীক্ষা করব কাদের ওপর? আমি তখন বেপরোয়া হয়ে গেছি। ভাবলাম, এমনিতে না পাওয়া যায়, কৌশলে, এমন কি দরকার হলে জোর করে লোক ধরে আনব—হ্যাঁ, পুলিশের ভাষায় যাকে বলে কিড্‌ন্যাপ করা।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "বলিস কি? ও যে মস্ত বড় ফৌজদারী অপরাধ।"

সুভ্রাট বলল, "জানি বৈ কি? কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষা আমার কাছে আরও বড়। বলেছি না, আমি এখন বেপরোয়া। পরীক্ষা চালাবার জন্য লোক আমার চাই-ই। কিন্তু এ কাজ তো আমি নিজে করতে পারব না, তাই সাহায্য নিয়েছি পাড়ার যত উঠ্‌তি গুণ্ডা গোছের ছোকরাদের—যাদের তোরা বলিস মাস্তান। ওদের সঙ্গে ভাব করে, ওদের খাইয়েদাইয়ে, দরকার মত হাতখরচের পয়সাকড়ি যুগিয়ে ওদের আমি আপনার করে নিয়েছি। তারপর ওদেরই সাহায্যে শিকার ধরে ধরে নিজের পরীক্ষা চালাচ্ছি।

সুভ্রাট একটু থামল, তারপর যেন একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলল, "দেখ্‌, সোমনাথ, এই সুযোগে ওদেরকেও আমি বেশ ঘেঁটে দেখেছি। ওদের আমরা সমাজবিরোধী, উঠ্‌তি গুণ্ডা, মাস্তান অনেক কিছু বলি; কিন্তু ওদের মধ্যেও প্রাণ আছে সে পরিচয় আমি পেয়েছি। সমাজের বিমুখতার জন্যই আজ ওরা এমনটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের ভালোবাসলে, ওদের অভাব দূর করলে, সহানুভূতির সঙ্গে মিশলে দেখবি, ওদের তোরা যতটা খারাপ মনে করিস তা ওরা নয়। বিপদে-আপদে ওরাই এগিয়ে আসতে পারে—যা তথাকথিত ভালো ছেলেরা কখনোই পারে না। আমার এ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হলে আমি ওদের নিয়ে কাজ শুরু করব—ওদের ঠিকমত মানুষ করার কাজ।

"যাই হোক, জো ডিম্বোকে মত্ত অবস্থায় কিড্‌ন্যাপ করে এনেছিল আমারই ছোকরারা। এবং আমার ল্যাবরেটরীতে বসে আমিই ওর মগজের ক্রোধ-

হিংসা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করার জায়গাগুলি নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে আনন্দ আর ফূর্তির জায়গাগুলো যাতে বেশি কাজ করে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কাজেই জো ডিম্বো কুস্তি করবে কি; ফূর্তির চোটে শিউশরণের সঙ্গে গলাগলি করার জন্যই ও তখন ক্ষেপে উঠেছে।

"এই পরীক্ষায় সফল হবার ফলেই আমি নিজে বুল্ ফাইটের মত অত বড় একটা বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধা করি নি। যদিও জানতাম কোথাও সামান্য একটু হিসেবের ভুল হয়ে গেলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। এখানে আরও একটু অসুবিধা ছিল। মানুষকে যত সহজে কিড্ন্যাপ করা যায় অত বড় একটা ষাঁড়কে তো তা করা যায় না! এজন্য আমাকে নিজেকেই যেতে হয়েছিল ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে—গ্যাস-মুখোশ প'রে রাতের অন্ধকারে। অবশ্য সেখানেও ঐ মাস্তান ছোকরাগুলিই ছিল আমার প্রধান সহায়। সেখানে দরোয়ান, পাহারাদার এবং ষাঁড়গুলোকে ঘুমপাড়ানী গ্যাস ছড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে অচৈতন্য করে তারপর ঐ বিশেষ ষাঁড়টির মগজের ক্রোধ আর হিংসার জায়গাগুলো নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলাম ইন্জেকশনের সাহায্যে,—যদিও এখানে জায়গাগুলো খুঁজে বার করতে বেশ মেহনৎ করতে হয়েছিল আর ওষুধের ডোজও দরকার হয়েছিল অনেক বেশি। কিন্তু আমার যে ভুল হয় নি তা তো স্বচক্ষেই দেখেছিস! ঐ দুর্দান্ত ক্ষেপা বদ্‌মেজাজী ষাঁড়টাও যেন মন্ত্রবলে শকুন্তলা নাটকের সেই আশ্রম-মৃগের মত হয়ে পড়েছিল। তাই না?"

শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। ঘোর ভাঙল সুভ্রাটের অট্ট-হাসিতে।—"কি রে, তুইও যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলি! কফি যে পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল! নাঃ; তোর মগজেও এবার একটা ইন্জেকশন্ দিয়ে দিতে হবে দেখছি অন্যমনস্ক ভাবটাকে তাজা করতে। দিবি নাকি মুণ্ডুটা ফুটোস্কোপের তলায়?"

আবার অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে তুলল সুভ্রাট।

ফিরিঙ্গির গড়

"এই নিয়ে পর পর তিনটি। আর তো গড়িমসি করা যায় না। এবার যা হোক্ একটা বিহিত করুন।" —নন্দলাল বাবু সক্ষোভে কথাটা উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিটাও একবার মাটিতে ঠুকে নিলেন।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে থানার দারোগার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। নন্দলাল বাবু এখানকার সম্মানিত লোক, বয়সেও প্রবীণ। তাঁর কথা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দারোগা বাবু আমতা আমতা করে বললেন, "তা তো বুঝি স্যর, কিন্তু মফঃস্বল শহর, থানায় লোকবলও তেমন একটা কিছু নেই। তবু চেষ্টা তো করছি প্রাণপণে। কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক মনে হচ্ছে। এখানে এ রকম ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা কল্পনা করাও যায় না।"

বাস্তবিক মফঃস্বল শহরের পক্ষে এ এক অভাবনীয় ঘটনা বলতে হবে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে তিন তিনটি ছেলে যেন ভোজবাজির মত কোথায় হারিয়ে গেল! প্রথমে দত্তপাড়ার শ্যামু মিত্তিরের ছেলে টোকন, তারপর জাঁদরেল অফিসার সোম সাহেবের ছেলে সুব্রত, আর তারপর গতকাল ধনী ব্যবসায়ী রামখিলন ফিটকিরিওয়ালার ছোট ছেলে মিশ্রীলাল। নেহাৎই কচি ছেলেটা, বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোয় না,—বেরোলেও সঙ্গে লোক থাকে। সেই লোকের চোখে ধোঁকা দিয়ে বেমালুম যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ছেলেটা! ফিটকিরিওয়ালা শোকে ভেঙ্গে পড়েছে একদম। কাল রাত্রেই দারোগা বাবুকে এসে বলে গেছে যেমন করে হোক ছেলে খুঁজে দিতে হবে—যত টাকা লাগে লাগুক। —পান সো—হাজার—পাঁচ হাজার। উস্‌সে ভি জিয়াদা। কিন্তু ছেলে তার ফেরৎ চাই-ই।

শহরের সর্বত্র এই এক আলোচনা। পথে-ঘাটে, হাটে বাজারে, চায়ের দোকানে, স্কুলে-কলেজে, এমন কি আপিস-আদালতেও ঐ এক কথা। শহরে কি সত্যি ছেলেধরার দল এল? যদি এসেই থাকে, গেল কোথায়? কোথায় লুকিয়ে আছে তারা?

বালক সঙ্ঘের বৈকালিক আসর বসেছে। বাৎসরিক পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে, রেজাল্ট বেরোবার আগে এখন ঠিকমত ক্লাসও হচ্ছে না। ছেলেরা স্কুলে যায়, গল্পগুজব করে, হৈ-হৈ করে, ২।৪ জন মাস্টার মশাইদের পেছনেও ঘোরে—আগে ভাগে নম্বর জানবার জন্যে। বাকিরা মতলব আঁটে কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়, কোথায় করা যায় চড়ুইভাতি। এখন ছেলেদের হাতে অফুরন্ত অবসর, আর চড়ুইভাতির পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। শীতের দিনে দুপুর রোদে খোলা বাগানে বা বনেজঙ্গলে সময়টা কাটে ভালোই। তারপর অপটু হাতের আধসিদ্ধ খিচুড়ি আর গরম গরম বেগুনি আর মাছভাজা—তা সে যত অবেলাতেই নামুক না কেন,—লাগে যেন অমৃত। বালক সঙ্ঘেরও বাৎসরিক চড়ুইভাতি এই সময়েই হবে ঠিক ছিল, এরই মধ্যে এই অঘটন।

তাপস বললে, "এর পর কি আর ফিরিঙ্গির গড়ে গিয়ে পিক্‌নিক্ করা ঠিক হবে ?"

ভূপতি সায় দিতে যাচ্ছিল কিন্তু মহীতোষ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "যত সব ভীরু, কাপুরুষের দল! আমরা এতজন একসঙ্গে যাব, ওখানে যদি ছেলে-ধরা থাকেও, থোড়াই কেয়ার করি তাকে।" মহীতোষের সাহস দেখে সুমন্তও বোধ হয় মনে জোর পেল, বলল, "নিশ্চয়ই, ঠিক বলেছে মহী। অত সহজেই যদি ভয় পাই তবে বৃথাই এতদিন ক্লাবে লাঠি-মুগুর ঘুরিয়েছি।"

"কিন্তু ছেলেধরাই যে এ সব কাণ্ড করছে তার তো কোন প্রমাণ মেলে নি। এমনও তো হতে পারে কোনও অতিকায় দানব বা তুষার-মানব জাতীয় কোন জীব—মানে আমি ঠিক তুষার-মানব বলতে চাই না, এখানে গরম দেশে তারা কি করে আসবে ?—কিন্তু ধর, ঐ রকম কোনও রহস্যময় জীব—যেমন গরিলা-টরিলার স্বগোত্রীয় কিছু—" আমতা আমতা করে বললে টুকাই।

এবার ধমক দিল গোরাচাঁদ। "দেখ্ টুকাই, কতকগুলি আজগুবি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস পড়ে তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। চুপ্ করবি কিনা বল্?"

শেষ পর্যন্ত ভোটে ঠিক হ'ল আসছে রবিবারই পিক্‌নিক্ হবে এবং ফিরিঙ্গির গড়ের পাশেই হবে। একটু বেলাবেলি ফিরে এলেই চলবে।

শহরের মাইল ৩।৪ দূর দিয়ে একটা বড় নদী বয়ে চলেছে। গঙ্গারই একটা শাখা বলা চলে। স্থানীয় লোকেরা বলে চাঁপাই। প্রায় শ' আড়াই বছর আগে এখানে ফিরিঙ্গি পর্তুগীজ জলদস্যুদের খুব দাপট ছিল। এমন কি চাঁপাই নদীর

ওপর তারা একটা ছোটখাট কেল্লার মত বানিয়ে নিয়েছিল। তারা অবশ্য বলত, কেল্লা নয়—কুঠি, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তার নাম দিয়েছিল ফিরিঙ্গির গড়। কেল্লার মতই তার চারদিকে গভীর খাদ বা পরিখা কাটা। আজকাল অবশ্য সে খাদ শুকিয়ে গেছে, তবে জোয়ারের সময় মাটি ভিজে যায়। বর্ষাকালে সময় সময় একটু-আধটু জলও দাঁড়ায়, অন্য সময় খটখটে শুকনো। যাই হোক, সেই পর্তুগীজরা বহুদিন কেল্লা ছেড়ে চলে গেছে। এখন সেই পরিত্যক্ত ভাঙ্গা কেল্লা এখানে-সেখানে ধসে পড়ছে। লোকজন কেউই থাকে না, থাকবার সাহসও নেই কারো। কারণ এ অঞ্চলে পোড়োবাড়ির মতই এই পোড়ো কেল্লা ভূতুড়ে বাড়ি বলে পরিচিত। এক সময়ে বহু খুন-জখম—বহু অত্যাচার ঘটেছে এখানে। সন্ধ্যার পর কেউ আর তাই এদিকটায় আসতে চায় না। নদীর ওপর দিয়ে নৌকো করে যেতে যেতেও নাকি মাঝে মাঝে চাপা কান্নার আওয়াজ শোনা যায় কেল্লা থেকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানটি বড় রমণীয়। বড় বড় শাল আর পলাশ গাছের ছড়াছড়ি এদিকটায়। আশেপাশে দু'চারটে ছোটখাট ঝিলও রয়েছে। শাপলা আর পদ্মফুলে ভরা সেগুলি। স্থানীয় বালক সঙ্ঘের ছেলেরা যে এ জায়গাটিকে তাদের চড়ুইভাতির উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচন করবে এতে অবাক্ হবার কিছু নেই।

দেখতে দেখতে রবিবার এসে গেল। ছেলেরা দল বেঁধে জমায়েত হ'ল চড়ুইভাতির জন্য। সকাল থেকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। খাওয়াদাওয়ার পর একজন প্রস্তাব করল—"চল্ না, এসেছি যখন তখন আর একটু কাছ থেকে গড়টা দেখে আসি।"

দু'-একজন একটু কিন্তু কিন্তু করলেও বেশির ভাগই রাজী হ'ল। ছেলেরা এগিয়ে গেল কেল্লার কাছে।'

কিন্তু এ কি! খাদটা তো শুকনো নেই! কানায় কানায় ভর্তি হয়ে আছে জলে। শীতকালে নদীর জল তো এদিকে আসবার কথা নয়!—তবে?

গোরাচাঁদ আসবার সময়ে তার পোষা কুকুর ভোলাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এতক্ষণ ভোলা ছেলেদের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছিল, জল দেখে সে এগিয়ে এল খাদের ধারে। বোধ হয় তেষ্টা পেয়েছিল, লম্বা জিভটা সবে বার করে জলে ছুঁইয়েছে, অমনি কাঁপতে কাঁপতে সে ঠিকরে পড়ল পাশের ঘাসের ওপর এবং পড়েই অসাড় হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এমন আচম্কা ঘটল যে ছেলেরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কি যে

ঘটল, কি যে করতে হবে কিছুই যেন বুঝতে পারল না। ভোলা অবশ্য একটু পরেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট লাগাল শহরের দিকে। ছেলেরাও একটা অজানা আতঙ্কের আভাস পেয়ে তার পিছু নিল।

ঠিক এর পর দিনই শোনা গেল মহীতোষকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহীতোষ শুধু বালক সঙ্ঘের একজন উৎসাহী সভ্য নয়; গোরার প্রাণের বন্ধু। তাই আঘাতটা লাগল তারই সবচেয়ে বেশি। বালক সঙ্ঘের সভ্যদের মধ্যে এই গোরা আর তার বন্ধু কালাচাঁদই সবচেয়ে সাহসী। তারা ঠিক করল যে ভাবেই হোক বন্ধুকে খুঁজে বার করবেই।

ঘটনার সঙ্গে ফিরিঙ্গির গড়ের কিছু যোগাযোগ আছে এমন একটা সন্দেহ অনেকের মনেই দানা বেঁধেছিল। কিন্তু ঐ ভূতুড়ে বাড়িতে গিয়ে পরীক্ষা করা সহজ কথা নয়। ব্যাপারটা যদি সত্যিই ভৌতিক কাণ্ড হয় তবে দিনের বেলা তার কোন হদিস পাওয়া সম্ভব হবে কি? আবার রাত্রিতেও ঐ নির্জন পোড়ো-বাড়িতে যেতে হলে দস্তুরমত বুকের পাটা দরকার। তারপর খাদের মধ্যে হঠাৎ-আসা ঐ জল, আর সেই জল খেতে গিয়ে ভোলার বিপত্তি! সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভোলা অমন করে পালাল কেন? ও কি কিছু একটা বিভীষিকার আঁচ পেয়েছিল? নিশ্চয়ই তাই। ওদের কতকগুলি ইন্দ্রিয় তো মানুষের তুলনায় অনেক প্রখর হয়।

গোরা কালাচাঁদকে বলল, "হরে মাঝির অনেকগুলো ডিঙ্গি আছে। চাইলে একটা দেবে নিশ্চয়। তাতে করে যদি তোতে আমাতে সন্ধের পর নদীর ওপর দিয়ে একটা চক্কর দিয়ে আসি তা হলে কেমন হয়? উল্টো দিক্ থেকে কেল্লাটা অন্ততঃ দেখে আসা যায়। নদী থেকেই তো খাড়া উঠে গেছে!"

কালাচাঁদ একটু আমতা আমতা করে শেষে সায় দিল।

পরদিনই সন্ধ্যা হতে না হতে একটি ছোট ডিঙ্গি নৌকো দেখা গেল ধীরগতিতে কেল্লার পেছন দিক্ দিয়ে নদীর ওপর ভেসে চলেছে। ডিঙ্গির আরোহী দু'টি ছেলে। চলতে চলতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা কেল্লার দিকে লক্ষ করছে।

হঠাৎ গোরা কালাচাঁদকে আস্তে একটু চিমটি কাটল—"দেখতে পাচ্ছিস?"

"কি?"

"ঐ যে কোণের দিকে বুরুজটার পাশে ঘুলঘুলি দিয়ে একটা মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে না?"

"আরে, তাই তো! এই পোড়োবাড়িতে আলো আসছে কোত্থেকে?" মুখে প্রশ্ন করল বটে কিন্তু কালাচাঁদের সারা গায়ে তখন কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

"শুধু আলো নয়, একটা কান্নার মত আওয়াজও আসছে যেন।"

"না ভাই, আমার বড় ভয় করছে। আজকের মত ফিরে যাই চল্।"

সকালে উঠেই গোরা কালাচাঁদকে নিয়ে থানায় হাজির হ'ল। খাদের জলের কথা, ভোলার আতঙ্কের কথা এবং কালকের রাতের অভিজ্ঞতার কথা সবই বলল দারোগাকে। দারোগা বাবু হেসে বললেন, "মনে ভয় থাকলে ও রকম অনেক কিছুই দেখাশোনা যায়। রজ্জুতে সর্পভ্রম বলে একটা কথা আছে জান তো? খুব ডিটেক্‌টিভ আর ভূতের গল্প পড় বোধ হয়? আজকালকার গল্প-লিখিয়েগুলোও যা হয়েছে! ছেলেদের মাথা চিবিয়ে খেতে ওস্তাদ্। যত্তো সব—" বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

বেরিয়ে এসে গোরা বলল, "এদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। আমি আজই সদরে যাচ্ছি। মামাকে দিয়ে পুলিশ সাহেব—এস্. পি. কে ধরব। তাঁর সঙ্গে মামার খুব ভাব।"

গোরার মামা সুধাংশু বাবু কোন্ একটা কলেজে জুয়লজির প্রফেসর। এস্. পি.-র সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম থাকার কথা নয়, কিন্তু আছে। কারণ এস্. পি. এক সময়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। গোরা সত্যিই গিয়ে তার মামাকে ধরল।

এস্. পি. সব শুনে বললেন, "আমিও শুনেছি। চার চারটে ছেলের নিরুদ্দেশ হওয়াও তো সহজ ব্যাপার নয়! আমি কালই ট্যুরে বেরুচ্ছি, প্রথমেই ওখানে যাব ঠিক করেছিলাম।" মামাকে বললেন, "তুমিও চল না, দু'দিন বোনের বাড়ি বেড়িয়ে আসবে।"

এস্. পি.-র নির্দেশে আবার ফিরিঙ্গির গড়ের পাশে এসে জড় হ'ল একদল লোক। সবাই পুলিশের লোক। গোরা এবং কালাচাঁদও তাদের সঙ্গ নিল।

সত্যিই কেল্লার পরিখা কানায় কানায় জলে ভর্তি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর কিছু চোখে পড়ে না। হেড্ কনস্টেবল চুকন্দর সিং খুব সাহসী। "কোতো আর জোল হোবে, দেখি?" বলে সে জুতো খুলে এগিয়ে গিয়ে জলে পা ডোবাল। হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে বীরের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তার গালপাট্টা দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে মুচকি হাসি।

হঠাৎ, কিছুর মধ্যে কিছু না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। শরীরটা বার দুই কেঁপে উঠল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

এই অভাবিত ব্যাপারে সকলেরই মুখ সাদা হয়ে গেল। দারোগা বাবু ভয়ে

থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। হেড কনস্টেবলটির চিকিৎসা করা দরকার—সে কথাও তাঁর মনে এল না।

চুকন্দর সিংএর জ্ঞান হ'ল সেই পরদিন। প্রথমটা তো সে ভয়ে কথাই বলতে পারে না। তারপর, একটু সুস্থ হয়ে, জানাল—অবাক্ কাণ্ড! নদীর জল যে এত লোণা হয় তা তার জানা ছিল না। আচম্‌কা বিদ্যুতের শক্ লাগলে যেমন হয় তেমনি একটা ধাক্কা খেয়েছিল সে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সুধাংশু বাবুও শুনলেন কথাটা। তারপর সারা দিন ধরে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন অস্থির ভাবে।

বিকেলের দিকে তিনি থানায় এসে হাজির। বললেন, "আমি আবার একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই। একটা খুব জোরালো ফ্লাড লাইটের মত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। সন্ধ্যার পর আমরা আজ আবার যাব ঐ ফিরিঙ্গির গড়ে।"

এস্. পি. সকালেই চলে গিয়েছিলেন—আবার ফিরে আসবেন ভরসা দিয়ে। দারোগা বাবু প্রথমটা একটু গাঁইগুঁই করলেন, কিন্তু সুধাংশু বাবু যে এস্. পি-র অন্তরঙ্গ বন্ধু তা তাঁর জানা ছিল, সুতরাং রাজী হতে হ'ল। সন্ধ্যা হতে না হতেই আলো, বন্দুক এবং দলবল সহ সবাই রওনা হলেন গড়ের দিকে।

পরিখার ধারে এসে সুধাংশু বাবু জলের মধ্যে তীব্র ফ্লাড্ লাইট্ ফেলে চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর মনে হ'ল তিনি যেন বেশ একটু খুশি হয়েছেন।

"দেখ তো খাদের ওপারে কেল্লার ভেতরে যাবার কোনও শুকনো পথ আছে নাকি?"

সবাই খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। হঠাৎ গোরা চীৎকার করে উঠল, "এখানে একটা খুব চওড়া পাইপের মুখ দেখতে পাচ্ছি। মস্ত বড় পাইপ। ভেতরের হাঁ-টা প্রায় ৫।৬ ফুট হবে। মনে হচ্ছে জলের তলা দিয়ে চলে গেছে।"

সত্যিই তাই। খাদের মধ্যে এপার-ওপার জুড়ে কে বা কারা একটা বিরাট ফাঁপা নল বসিয়ে রেখেছে। এমন ভাবে বসানো হয়েছে যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে হেঁটে কেল্লার দেয়াল পর্যন্ত পৌছনো যায়, অথচ জলের সংস্পর্শে আসতে হয় না। সুধাংশু বাবু বললেন, "আগে আগে রিভলভার নিয়ে দু'জন এগিয়ে চলুন, পেছনে আমরা থাকব।"

পরিত্যক্ত কেল্লা। পাঁচিলের গায়ে এখানে ওখানে ফাটল। তারই একটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়তে কোন অসুবিধা হ'ল না। গোরা আঙুল দেখিয়ে

বলল, "উত্তর দিকের ঐ বুরুজটার ওপরে আলো দেখেছিলাম।" সকলে সন্তর্পণে সেই দিকে এগিয়ে চলল।

ওপরে ওঠার একটা ঘোরানো সিঁড়ি। তাই বেয়ে সাবধানে উঠতেই পাওয়া গেল একটা সরু বারান্দা। কিন্তু অন্যান্য জায়গার মত ধুলো-জমা নয়, কে যেন পরিষ্কার করে ঝাঁট দিয়ে রেখেছে।

"ভূতেরাও তা হলে ঝাঁটা ধরতে জানে দেখছি!"—সুধাংশু বাবু মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন।

আর একটু এগোতেই একটা বড় হল্ ঘর পাওয়া গেল, আর সেই ঘরেরই এক কোণে—

হ্যাঁ, নিরুদ্দেশ চার চারটি ছেলেই একটা মাদুরের ওপর পড়ে রয়েছে, আর তাদের পাহারা দিচ্ছে মিশ্‌কালো ষণ্ডা গোছের দু'জন লোক। কিন্তু তাদের কেউই বাঙ্গালী নয়।

তাদের প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়েই পুলিশের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। তারপর পিছমোড়া করে বাঁধতে আর কতক্ষণ?

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

একটা আন্তর্জাতিক দুর্বৃত্ত দল দেশের নানা জায়গায় এই কাণ্ড করে চলছিল। উদ্দেশ্য—ভালো ভালো পরিবারের ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে দেশবিদেশে গোপনে বিক্রি করে দেওয়া। কে না জানে দাস-ব্যবসা আইনতঃ উঠে গেলেও পৃথিবীর বহু জায়গায় গোপনে এখনও তা চালু আছে। বাংলাদেশেও তারা জাল বিছিয়েছিল এবং এই শহরে একটা পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ি বা কেল্লার সন্ধান পেয়ে সেখানেই পেতেছিল তাদের সাময়িক আড্ডা-খানা।

কিন্তু খাদের ঐ জল? হঠাৎ শুকনো খাদ কানায় কানায় জলে ভরে ওঠা খুবই অস্বাভাবিক। কিন্তু তখনও কেউ ততটা সন্দেহ করে নি। সন্দেহ করলেন সুধাংশু বাবু,—যখন কনস্টেবলের কাছে শুনলেন জলটা অসম্ভব লোণা। এখানকার নদীর জল সুস্বাদু, কাজেই ঐ লোণা জল নদীর নয়। তা হলে? তা হলে কেউ ইচ্ছে করেই ওখানে লোণা জল এনে ফেলেছে। কিন্তু কেন?

সুধাংশু বাবু প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক, সামুদ্রিক প্রাণীদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট। তাঁর মনে হ'ল নিশ্চয়ই ওখানে কিছু সামুদ্রিক প্রাণী এনে রাখা হয়েছে এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই ঐ রকম জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু কী সে প্রাণী?

গোরার কুকুর ভোলার এবং তারপর কনস্টেবল চুকন্দর সিং-এর হঠাৎ জল ছুঁয়েই অসাড় হয়ে যাওয়া শুনলে একটা কথাই মনে আসে—জলের মধ্যে ইলেকট্রিক শকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। আর এ কাজে ইলেকট্রিক ঈল বা বৈদ্যুতিক বাণ মাছই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

পৃথিবীর নানা জায়গায় এই রকম সামুদ্রিক ঈল মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের শরীরের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে এরা একটা ঝাপটা মারলেই প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্ বা আঘাত হানতে পারে। কোন কোন ইলেক্ট্রিক ঈল ২২০ থেকে ৫৫০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে—যা মানুষ বা অনেক প্রাণীকে একদম মেরেও ফেলতে পারে, অসাড় করে দেওয়া তো কিছুই না।

গভীর খাদের মধ্যে দিনের বেলা ওরা হয়তো জলের নীচে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করবে, তাই পরীক্ষা করার জন্য সুধাংশু বাবু সময় বেছে নিয়েছিলেন সন্ধ্যার পর। তখন ফ্লাড্ লাইটের নীচে ওরা আত্মগোপন করতে পারে নি।

দুর্বৃত্তেরা কেল্লাটিকে ভৌতিক প্রমাণ করবার জন্যই যে এ কাজ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঐ অলৌকিক কাণ্ড দেখলে কেউ তো ওর ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না! তারপর সুবিধা মত বন্দীদের গোপনে চালান করে দিলেই হ'ল। কিন্তু ছোট ছোট দু'টি ছেলেই যে শেষ পর্যন্ত তাদের আশায় ছাই দেবে তা কি তারা ভাবতে পেরেছিল?

রঙ্গিলা পাহাড়ের নীলকুঠি

কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেছে সুমন্ত্রের। এবারে একটা সুবিধামত চাকরি যোগাড় করে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারে।

সেই উদ্দেশ্যেই সেদিন সে এসেছিল নন্দবাবুর বাড়ি। নন্দ মিত্তির মুরুব্বি লোক, আর তার কাকার বিশেষ বন্ধু। বেশ খাতির করেই বসালেন নন্দবাবু। চা-টা খাওয়ালেন। তারপর বললেন, 'দেখি তোমার কোয়ালিফিকেশনগুলো ?'

সুমন্ত্র কাগজগুলো এগিয়ে দিতেই চশমাটা নাকের কাছে নামিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে, তুমি যে দেখছি মস্ত পণ্ডিত লোক! একেবারে ফার্স্ট-ক্লাস এম. এ.! দেখে তো বড্ড ভালোমানুষ মনে হচ্ছিল!' তারপর আবার হাসি।

শেষে বললেন, 'একটা চাকরি তো এখনই ঠিক করে দিতে পারি। কালই কথা হচ্ছিল কোম্পানীর কর্তাদের সঙ্গে। কিন্তু তোমার কি সে কাজ ভালো লাগবে? মাইনে অবশ্য মন্দ দেবে না—আর টিকে থাকলে ও-লাইনে উন্নতিও আছে। তবে থাকতে হবে মফঃস্বলে—একেবারে পাণ্ডববর্জিত জায়গায়।'

সুমন্ত্র বিনয়ে গদগদ হয়ে বলল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই, যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই যাব।'

এক কথায় চাকরি হয়ে গেল সুমন্ত্রের—এবং, দিন তিনেকের মধ্যেই, জিনিসপত্র গুছিয়ে সে চলে এল হিমালয়ের পাদমূলে বনজঙ্গলেঘেরা ডুয়ার্স অঞ্চলের এই রঙ্গিলা পাহাড় চা-বাগানে, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হয়ে।

রঙ্গিলা পাহাড়। নামটা যেমন সুন্দর, জায়গাটিও তেমন মনোরম। অদূরে সার বেঁধে পাহাড়ের শ্রেণী চলে গেছে। তার গায়ে কমলালেবুর বাগান। যখন পাকে দূর থেকে মনে হয় কে যেন পাহাড়ের গায়ে সিঁদুর গুলে লেপে দিয়ে গেছে। কে জানে, ঐ থেকেই পাহাড়টার নাম রঙ্গিলা পাহাড় কিনা! পাহাড়ের ওপাশেই ভুটান রাজ্য।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে তাদের এই চা-বাগান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,

ফিট্ফাট্। এখানে সেখানে সুন্দর সুন্দর বাংলো। কুলিবস্তিগুলোতেও আধুনিকতার ছোপ লাগানো হয়েছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট কিন্তু খরস্রোতা একটি নদী—তিস্তারই একটি শাখা হবে বোধ হয়। স্থানীয় নাম ঘূর্ণি।

কাজকর্ম খুব একটা বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া আধবয়সী ম্যানেজার বাবুটিও লোক বেশ ভালোই। সুমন্ত্র দু'দিনেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বৌদি সম্পর্ক পাতিয়ে ছেলেমেয়েদের কাকাবাবু হয়ে, ঘরের লোক হয়ে পড়ল।

কিন্তু তবু কেমন একটু নিঃসঙ্গ লাগত তার। ম্যানেজার বাবুর সময় কম। তা ছাড়া তিনি যে-সব বিষয়ে আগ্রহশীল তা নিয়ে বেশিক্ষণ আলাপ করা যায় না। কোন্ বাগানের শেয়ার কত দামে বিক্রি হচ্ছে, কোন্ বাগানে এবার কত 'ডিভিডেণ্ড' দেবে, কোথাকার চালে কি গুণ, কোথায় গেলে তা সস্তায় পাওয়া যেতে পারে—এই সবই হচ্ছে তাঁর মুখরোচক আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সুমন্ত্রের বয়সী ছেলে এ নিয়ে কতক্ষণ আলাপ চালাতে পারে? বৌদি, অর্থাৎ ম্যানেজারবাবুর স্ত্রীও সাংসারিক আলোচনা ছাড়া আর কিছুর ধার ধারেন না। তবে ভদ্রমহিলা নানা রকম সৌখীন রান্নায় ওস্তাদ, কাজেই তাঁকে এড়িয়ে চলা যে খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয় সেটা সুমন্ত্র ঠিক বুঝে নিয়েছে।

অবশ্য বেড়ানোর জায়গা আছে যথেষ্ট। হাতে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে নদীর ধারে ধারে বরাবর হেঁটে যাও। প্রকৃতি তার সমস্ত সমারোহ নিয়ে তোমার সামনে উজাড় করে দেবে আপনাকে। কাজেই একটু বেলা পড়তে না পড়তেই বেরিয়ে পড়ত সুমন্ত্র এবং ক্রমে এটা একটা বাতিকে গিয়ে দাঁড়াল।

সেদিনও এমনি বেরিয়েছে সে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বোধ হয়. হঠাৎ খেয়াল হ'ল কখন নদীর ধার থেকে অন্য পথে চলে এসেছে, আর সামনেই পথ আটকে রয়েছে মস্ত একটা ঝিল। অবশ্য ঝিলের পাশ দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ ওদিকে চলে গেছে; কিন্তু খুব যে সেটা ব্যবহার করা হয় এমন মনে হ'ল না। তবু খেয়ালের মাথায় সুমন্ত্র সেই কাঁচা পথ ধরেই আর একটু এগিয়ে এল।

দু'পাশে বন-ঝাউএর সারি। তারপর আরও বড় বড় গাছ—যাদের বলতে ইচ্ছা করে বনস্পতি। আর সেই বনস্পতিবৃন্দের পেছনে এ কি ব্যাপার! এখানে এত বড় বিরাট একটা বাড়ি এল কী করে?

হঠাৎ দেখলে বাড়িটাকে একটা ছোটখাট দুর্গের মত মনে হয়। দুর্গের পরিখার মতই সামনে খানিকটা জলও আছে, সাঁকো বেয়ে পার হতে হয় সেটা। অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি, জায়গায় জায়গায় বট-অশ্বত্থ শিকড় গেড়ে বসেছে।

ফলে দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। দেখলে মনে হয় বুঝি পোড়োবাড়ি। কিন্তু না, ওদিকের একটা জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেখাও দেখা যাচ্ছে যে! ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক মনে হচ্ছে তো! আর, এমন একটা বাড়ির গল্প তো ম্যানেজার বাবু বা আর কারও কাছে শোনে নি সে!

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, তাই সেদিনকার মত ফিরে এল সুমন্ত্র।

পরদিন রবিবার। অফিসের তাড়া নেই। সকালবেলা বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ খুলে তিনদিনের বাসি খবরগুলো পড়ছিল। এখানে ওগুলিই টাট্‌কা। হঠাৎ ভারী পায়ের শব্দে চমকে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে 'ভেতরে আসতে পারি?' বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে সামনের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন। তারপর পেছন ফিরে শিস দিয়ে ইশারা করতেই একটি ছোকরা মত লোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে ইতস্ততঃ মুখে ভেতরে ঢুকল এবং ভদ্রলোকের পাশের চেয়ারটিতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বসে পড়ল—একেবারে পা তুলেই পোষা প্রাণীটির মত।

'ভারি মুখচোরা আমার এই সঙ্গীটি।'—বলে হাসতে হাসতে আগন্তুক কথা শুরু করলেন।—'আপনি তো নতুন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হয়ে এসেছেন? শুনলাম খুব পণ্ডিত লোক আপনি—ফার্স্ট্‌ক্লাশ এম. এ.। তা এত জায়গা থাকতে এই চা-বাগান পছন্দ করলেন কি করে?'

'মানুষ ঘটনার দাস।'—সলজ্জ ভাবে বলল সুমন্ত্র।

'যা বলেছেন।'—হাসিমুখে বললেন আগন্তুক।—'এই দেখুন না আমাকেই। ও, আমার পরিচয়ই তো দিই নি এখনও! সারা জীবন নানা হুল্লোড়ে কাটিয়ে শেষে প্রায় বুড়ো বয়সে এখানে এলাম বাগানের ডাক্তারি নিয়ে। কিন্তু তাও বেশি দিন করতে পারলাম কই! অথচ জায়গাটা এমন ভালো লেগে গেল যে এর মায়াও কাটাতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছি এখানেই—বাগানের সঙ্গে বাঁধা না থেকেও,—চিরঞ্জীব ডাক্তার হয়ে।'—আবার হেসে উঠলেন আগন্তুক। প্রাণখোলা হাসি।

সুমন্ত্র এবার ভালো করে চেয়ে দেখল। আগন্তুক বাংলা বলছেন চমৎকার, কিন্তু চেহারায় ঠিক বাঙালীর ছাপ নেই। চুলেও বেশ পাক ধরেছে। পরনে সাদা ট্রাউজারের উপর লং কোট, হাতে একটা ছড়ি। লিক্‌লিকে, কিন্তু অস্ত্র হিসেবে ওর মূল্য আছে।

আর সঙ্গী ছোকরাটি? তার রকম-সকম দেখে ভারি মজা লাগল সুমন্ত্রের।

মিটমিট করে এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছে, কড়িকাঠ থেকে ঘরের আনাচে-কানাচে সব দিকে। আবার চোখাচোখি হতেই চমকে উঠছে যেন।

এই সময় চাকর সনাতন এক পেয়ালা চা আর এক প্লেট ওমলেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। সুমন্ত্র তাকে আরও দু'কাপ চা আর ওমলেট আনতে বলল।

'না না, ওর জন্য ওমলেট লাগবে না। ও ও-সব একদম পছন্দ করে না। বরঞ্চ ঘরে কলা কি অন্য ফল থাকলে ওকে দু'-একটা দিতে পারেন ; খুশি হবে।'—বললেন ডাক্তার চিরঞ্জীব।

বাস্তবিক কলা পেয়ে ছোকরা যে এত খুশি হবে সুমন্ত্র তা ভাবতে পারে নি। সনাতন এক ছড়া কলা এনে টেবিলে রাখতেই সে ছোঁ মেরে এসে তুলে নিল, গোটা ছড়াটাই। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে খোসা-সমেতই মুখে পুরে দিতে লাগল একটার পর একটা। অবশ্য খোসাটা সত্যি খেল না সে, মুখ থেকে বার করে ঘরের মেঝেতে ছড়াতে লাগল। মাথা খারাপ নাকি ছেলেটার?

ডাক্তার চিরঞ্জীব চা-ওমলেট দুই-ই ধীরে-সুস্থে শেষ করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আচ্ছা, আজ উঠি। আসব মাঝে মাঝে। কথা বলার লোকের বড্ড অভাব এখানে।'

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাইরে বেরিয়ে এসে আবার তেমনি শিস্ দিলেন তিনি ; সেই ছোকরাটিও তিড়িং করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। তারপর হাত দু'টি সটান ওপরে তুলে দিয়ে হেলতে দুলতে অনুসরণ করল তাঁকে। দেখে কোন রকমে হাসি চেপে রাখল সুমন্ত্র।

সেদিন বিকেলবেলা সুমন্ত্র আবার বেড়াতে বেরোলো নদীর পাড় ধরে। কিন্তু আজ আর বেশি দূরে যাওয়া হ'ল না। একটু গিয়েই দেখল ঘূর্ণির পাড়ে একটা ছোট টুল পেতে বসে একজন বিদেশী ভদ্রলোক মাছ ধরছে। পাশে ২।৩টি বড় ছিপ আর একটা দোনলা বন্দুক।

মাছ ধরার নেশা সুমন্ত্রেরও কম নয়। সে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারে মৎস্য-শিকারীর নজর পড়ল তার দিকে। একটু থতমত খেয়ে সলজ্জ হেসে বলল, 'কি দেখছেন? বসে থাকাই সার। এতক্ষণে একটাও মাছ পেলাম না।'

সুমন্ত্র জবাব দিল, 'এখানে বড্ড জলের তোড়। অ্যাঙ্গলিং-এর পক্ষে জায়গাটা ভালো বাছেন নি। তবে মাছ ছাড়া অন্য শিকারেরও বোধ হয় বাতিক আছে আপনার—বন্দুক নিয়ে যখন বেরিয়েছেন?'

'না, ওটা আপাততঃ শিকারের জন্যে নয়, আত্মরক্ষার জন্যে। এদিকে প্রায়ই

ভালুক-টালুক বেরোয় শুনেছি। মাছ ধরছি সঙ্গীর অভাবে। তা আপনাকে নতুন দেখছি এখানে। বেড়াতে এসেছেন বুঝি?'

'না, চাকরি নিয়ে এসেছি ঐ রঙ্গিলা পাহাড় চা-বাগানে।'

'ও, আপনিই বুঝি ওখানকার নতুন এ. এম?—মিস্টার চ্যাকোভার্টি? তা হলে ভালোই হলো। আমিও এক পথের পথিক। শিমূলগুড়ি চা-বাগানে এ. এম. হয়ে আছি।'

রঙ্গিলা পাহাড়ের পাশেই, ঘূর্ণির বাঁক পেরোলেই শিমূলগুড়ি চা-বাগান। এটি সাহেবী বাগান; ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার—সবাই সাহেব। সুমন্ত্র এইটুকুই শুধু জানত। কিন্তু দেখল, ওখানকার ওরা তার চেয়ে বেশি খবর রাখে।

বিদেশী ভদ্রলোকটির নাম উইলহেল্‌ম্‌ ফিশার; জাতিতে জার্মান। বয়সে প্রায় সুমন্ত্রের মতই হবে। ফূর্তিবাজ, দিলখোলা লোকটি। জার্মানরা নাকি ঐ রকমই হয়। অত আদবকায়দার ধার ধারে না তারা। ফিশারও অল্প সময়ের মধ্যে দিব্যি আলাপ জমিয়ে তুলল। বলল, 'ক্লাব এখানে একটা আছে বটে, কিন্তু রোজ রোজ সেখানে আমার ভালো লাগে না। সেই বসে বসে বুড়োদের সঙ্গে শুধু তাস পেটো, বাজী ধরো, আর মাঝে মাঝে উঠে এক আধ-চুমুক হুইস্কি খাও। এখানে এমন সুন্দর পাহাড়, নদী, বনজঙ্গল ফেলে কে নিত্যি তিরিশ মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে বাজে কাজে ওখানে গিয়ে সময় নষ্ট করতে পারে বলুন তো? তা আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল, ভালোই হ'ল। আপনার কাছে এদেশের গল্প শুনব ভালো করে। আমাদের তো আবার জানেন, বড্ড কড়াকড়ি। বাগানের বাবুদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি বারণ। ওতে নাকি ওরা পেয়ে বসবে, ডিসিপ্লিন মানতে চাইবে না। অদ্ভুত আইডিয়া যা হোক কর্তাদের!'

ছিপটিপ গুটিয়ে উঠে পড়ল ফিশার। বলল, 'চলুন, একবার ঝিলের ধারে যাওয়া যাক্। ডাঃ চিরঞ্জীব ওদিকে থাকেন, তাঁকে একবার বুকটা দেখাব। কয়েক দিন থেকে কেমন একটা ব্যথা করছে। এ অঞ্চলে তো ঐ অসুবিধে, ভালো ডাক্তার নেই। অবশ্য বাগানের একজন মাইনে-করা ডাক্তার আছেন, কিন্তু গোল-মেলে ব্যাপারে তাঁর ওপর ভরসা রাখা কঠিন। তবে ডাঃ চিরঞ্জীব খুব ভালো ডাক্তার,—বিশেষ করে সার্জারিতে তাঁর হাত তো খুব চমৎকার। তবে তাঁকে সব সময় পাওয়া মুশকিল। প্রায়ই খুব ব্যস্ত থাকেন। পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি ঘোরেন নি। ভিয়েনায়ও, মনে পড়ে, ডাক্তারদের মুখে তাঁর নাম শুনেছি। সিঙ্গাপুরে তাঁকে প্রথম দেখি। সেখানেও তাঁর বেশ নাম-ডাক ছিল

ভালো সার্জেন বলে। এ হেন ডাক্তার চিরঞ্জীব যে শেষটায় বুড়ো বয়সে চা-বাগানে ডাক্তারি চাকরিতে কেন এসেছিলেন বোঝা মুশকিল। অবশ্য চাকরি তিনি বেশিদিন করেন নি। কিছুদিন পরেই ছেড়েছুড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। তারপর ঝিলের ওপাশে ঐ পুরোনো ক্যাস্‌ল্‌টা কিনে নিয়ে ওখানেই আড্ডা গেড়েছেন।'

'ক্যাস্‌ল্‌!' অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করল সুমন্ত্র।

'আমরা ক্যাস্‌ল্‌ই বলি। আসলে ওটা নাকি ছিল একটা নীলকুঠি। নীলের চাষ ওখানে হ'ত কিনা জানি না। হলেও সে বহুদিনের কথা। সে চাষও উঠে গেছে, কুঠিয়ালরাও কবে উধাও হয়েছে। পরিত্যক্ত বিরাট বাড়িটা নাকি ছিল ভুটানের রাজবংশের কার দখলে। কিন্তু কেউ দেখাশোনা করত না। লোকে বলত ভূতুড়ে বাড়ি। ডাঃ চিরঞ্জীবের নাকি ওটা ভারি পছন্দ হয়ে যায় এবং খুব অল্প দামেই তিনি ওটা কিনে নিয়ে ঘর বেঁধেছেন। অনেকের ধারণা ওটা ওঁর ল্যাবোরেটরী। ওখানে বসে উনি রিসার্চ করেন। ভগবান্ জানেন কিসের রিসার্চ। দেখেন নি বাড়িটা? ঝিলের ওধারে? ঠিক যেন একটা সেকেলে কেল্লা!'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল দু'জনে। তারপর হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে দু'জনেই থমকে দাঁড়াল।

একটা গাছের নীচে একটি লোক গাছের গুঁড়ি ধরে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—যেন ওপরের কাউকে ধমকাচ্ছে। আর গাছের ওপরে আর একটি লোক যেন দারুণ বিব্রত হয়ে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফালাফি করছে। যে রকম অবলীলাক্রমে সে ডালে ডালে ঘুরছে—কখনও হাত দিয়ে কখনও বা পা দিয়েই ডাল আঁকড়ে, তাতে সে যে গাছে-চড়া বিদ্যায় খুবই সুপটু তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিশোর তলাকার লোকটিকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল। লোকটি কটমট করে তাদের দিকে তাকিয়ে এবং বোধ হয় একসঙ্গে সাহেব আর বন্দুক দেখেই ধীরে ধীরে চলে গেল। তবে যাবার সময় বার কয়েক নীচু হয়ে মাটিতে কি যেন শুঁকবার চেষ্টা করল। লোকটি চলে গেলে ওপরের লোকটি সাহস করে একটু নেমে এল। সুমন্ত্র এবার তাকে চিনতে পারল। এ সেই লাজুক ছোকরা,—যে ডাক্তার চিরঞ্জীবের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়েছিল সকালবেলা। তাকে যে আজই এভাবে জঙ্গলের মধ্যে গাছের ওপর দেখতে পাবে সুমন্ত্র তা কল্পনাও করতে পারে নি।

'একটা জিনিস লক্ষ করেছেন মিস্টার চ্যাকোভার্টি? এই লোকগুলো ডাক্তার চিরঞ্জীবের ভারি অনুগত। প্রায়ই দেখবেন, এদের কেউ না কেউ ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আর ডাক্তার চিরঞ্জীবও, মনে হয়, ওদের সঙ্গে নিয়ে এখানে সেখানে

ঘুরতে ভালবাসেন। অথচ ওদের বুদ্ধি বা হালচাল দেখলে ওদের সঙ্গে ডাক্তারের হৃদ্যতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।'

ফিশারের কথা শেষ হবার আগেই মনে হ'ল দূরে কয়েকজন লোক এদিক্‌-পানেই আসছে। আর একটু কাছে এলে চিনতে আর ভুল হ'ল না। দলের নেতা হচ্ছেন ডাক্তার চিরঞ্জীব ও তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচ-সাতটি লোক। তাদের সকলেরই বয়স তেইশ-চব্বিশের মধ্যে। ডাঃ চিরঞ্জীবের হাতে সেই লিকলিকে ছড়িখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, সঙ্গের লোকগুলোর ব্যবহার। তাদের কেউ ডাঃ চিরঞ্জীবের গায়ে মাথা ঘষতে ঘষতে চলেছে, কেউ পেছন পেছন মাথা নীচু করে আসছে। মাঝে মাঝে এত হেঁট হচ্ছে যে মনে হয় বুঝি ওখানকার ঘাসের গন্ধ কি রকম তাই শুঁকে দেখতে চায়। কেউ একটু এধার-ওধার হলেই ডাঃ চিরঞ্জীব হুঙ্কার দিয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন শূন্যে, আর লোকগুলো থতমত খেয়ে আবার কাছে এসে জড়ো হচ্ছে।

কিন্তু সবচেয়ে মজা দেখা গেল, যখন ডাঃ চিরঞ্জীব তাঁর লম্বা কোটের পকেট থেকে দু'-তিনটি কলা বার করে শূন্যে ঝুলিয়ে শিস দিতে শুরু করলেন। চোখের পলক পড়তে না পড়তে দেখা গেল, সেই বৃক্ষবিহারী লোকটি সবেগে গাছ থেকে নেমে এল, আর মাথার ওপর দু'হাত তুলে দিয়ে টলতে টলতে ছুটে চলল ডাক্তারের দিকে। মানুষ যে কলা খেতে এত ভালবাসতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্ট। ফিশার আর সুমন্ত্র অর্থপূর্ণ ভাবে তাকাল পরস্পরের মুখের দিকে।

কয়েকদিন পরের কথা। ম্যানেজারের অফিস ঘরে বসে সুমন্ত্র কতকগুলি দরকারী কাগজপত্র দেখছিল, এমন সময় বাগানের কুলি-সর্দার ঝমরু অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে এসে জানাল, তার শালার ছেলে মেঘুয়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ধরনের খবর নতুন নয়। গত কয়েকদিন থেকেই বাগানের আশেপাশে ছেলে হারাবার হিড়িক পড়ে গেছে। বেশির ভাগই চা-বাগানের কুলি-ব্যারাকের ছেলে এবং সবাই একেবারে ছোটও নয়—জোয়ান জোয়ান ছেলেও আছে। কুলিমহলে এ নিয়ে খুবই একটা আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেছে। তাদের ধারণা আশেপাশে কোথাও অপদেবতার আবির্ভাব হয়েছে। নইলে পর পর এতগুলি ছেলে যায় কোথায়? এই ভৌতিক আক্রমণের দু'-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর খবরও পাওয়া গেল। নানকু নিজের চোখে দেখেছে, ঝিলের ধারে এক বিরাট কালো ছায়ামূর্তি পা ছড়িয়ে বসে কুড়মুড় করে হাড় চিবুচ্ছে। বিশ্বাস না হয়, চিবুনো হাড়গুলো এখনও ঝিলের ধারে গিয়ে দেখে আসতে পার।

ঝমরু স্পষ্টই জানাল, কুলিবস্তিতে প্রবল উত্তেজনা চলছে। তারা কেউ আর কাজ করবে না ঠিক করেছে। মুণ্ডি দেবতার পুজো করে তাঁকে ঠাণ্ডা করতে হবে। নইলে সমস্ত বাগান পুড়ে খাক হয়ে যাবে। পুজোর জন্য যা টাকা লাগবে তা কুলিরা চাঁদা করে দিতে রাজী আছে, কিন্তু সরকার থেকেও কম করে একশ'টি টাকা না দিলেও চলবে না। পচাই মদই তো লাগবে অন্ততঃ বিশ হাঁড়ি।

কি আর করা যায়? দেবতার আগে কুলিদের শান্ত করা দরকার। মহা-সমারোহে পুজো শেষ হ'ল। পচাই-এর স্রোত বয়ে গেল কুলিবস্তির সামনেকার মাঠে। কিন্তু তবু দেবতা প্রসন্ন হলেন না। পরদিন শোনা গেল আবার একটি ছেলে নিখোঁজ হয়েছে এবং এটি আর কেউ নয় স্বয়ং ঝমরুর ছেলে।

বাগানের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কুলিরা ঘরে বসে ছেলে আগলাচ্ছে। কুলি-রমণীদের করুণ বিলাপে আকাশ ভারী হয়ে উঠল। আগের দিনই থানায় খবর পাঠানো হয়েছিল। প্রায় দশ ক্রোশ দূরে থানা, এখনও দারোগা তদন্তে আসতে পারেন নি। সুমন্ত্র ঠিক করল বাগানের লরি নিয়ে সে নিজেই চলে যাবে থানায়।

ঠিক এমনি সময়ে নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে ফিশার এসে হাজির। সুমন্ত্রের সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে চায়। অত্যন্ত জরুরী কথা।

তখনও সন্ধ্যা ভালো করে লাগে নি। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের রাত, অন্ধকার হতে বেশি সময় লাগবে না। তা ছাড়া আকাশটাও মেঘলা হয়ে আছে।

নীলকুঠির পেছন দিকের বন্ধ ফটক আস্তে আস্তে টপ্‌কে দু'টি মূর্তি সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দু'জনেরই পরনে আঁটসাঁট পোশাক; একজনের হাতে টর্চ, অন্য জনের হাতে বন্দুক। এরা আর কেউ নয়—সুমন্ত্র আর ফিশার। এ ক'দিনে এদের বন্ধুত্ব বেশ ঘনীভূত হয়েছে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল ওরা। সুমন্ত্র ভাবতেও পারে নি—এই পোড়ো-বাড়ির ভিতরে এত কাণ্ড থাকতে পারে। বাগানের একদিকে চিড়িয়াখানার মত বড় বড় কয়েকটি খাঁচা বসানো হয়েছে। তার ভিতরে নানারকম জানোয়ার—খরগোস, গিনিপিগ্ থেকে শুরু করে হরিণ, বাঁদর, কুকুর, রাম-ছাগল, এমন কি গোটা দুই ভালুক সুদ্ধ রয়েছে। ডাঃ চিরঞ্জীবের তাহলে জন্তুপোষারও বাই আছে।

টর্চ ফেলতে দেখা গেল একটা খাচার কোণে একটা বড় জাতের বাঁদর, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নির্জীবের মত পড়ে রয়েছে। তবে কি এরাই ডাক্তার চিরঞ্জীবের গবেষণার উপকরণ? কিন্তু কিসের গবেষণা?

বিস্মিত সুমন্ত্রকে ইশারায় চুপ করতে বলে ফিশার তেমনি সন্তর্পণে বাগান ছেড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকল। অত বড় বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করছে! জনপ্রাণীর সাড়া নেই কোথাও। শুধু রাশি রাশি ধুলো আর শুক্‌নো ডাল-পাতায় চারিদিক্ ছেয়ে আছে। কোথাও বা ছাদ ঝুলে পড়েছে। চামচিকের উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল সুমন্ত্রের।

ফিশার শেষে সাহসে ভর করে দোতলায় উঠতে লাগল। সুমন্ত্রও অভিভূতের মতন চলল পেছন পেছন। সেকালকার কাঠের সিঁড়ি। সেকালকার বলেই এত মজবুত। এককালে হয়তো কার্পেট-মোড়া ছিল; এখন তার ছালটুকু শুধু আছে। তবু এখনও তার ফলে শব্দ কম হয় সিঁড়িতে। সিঁড়ির মাথায় একটা সরু বারান্দা—অনেক দূরে চলে গেছে সেটা। আর তারই এক প্রান্তে একটা ঘর থেকে আলোর ক্ষীণ রেখা এসে পড়েছে উল্টো দিকের দেয়ালে। ফিশার এবার সেই দিকে এগিয়ে চলল।

অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে। কারা যেন চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। তারপরেই একটা গোঙানির শব্দ, দ্রুত পা ফেলার ঝট্‌পট্ আওয়াজ। সুমন্ত্রের হাত-পা কাঁপছে। ফিশার বজ্রমুষ্টিতে তার একটা হাত ধরে বলল, 'এখন নার্ভাস হলে চলবে না চ্যাকোভার্টি! পরমুহূর্তেই একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে সুমন্ত্রকে টেনে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতরে।

তারপর সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। সামনে একটা অপারেশন টেবিলের ওপর আপাদমস্তক সাদা কাপড়-জড়ানো একটি রোগী পড়ে আছে। একজন দীর্ঘাঙ্গিনী নার্স তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। চেহারা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় সে এ অঞ্চলের মেয়ে নয়।

আর ডাক্তার চিরঞ্জীব? তিনি মাথায় নাক-ঢাকা টুপি পরে অদূরে দাঁড়িয়ে আর একজন ডাক্তারী পোশাক-পরা লোকের সঙ্গে মৃদুস্বরে কি আলোচনা করছিলেন। পাশে আর একটা স্ট্রেচারে কালো চেহারার জোয়ান গোছের একটি ছেলে অবসন্ন ভাবে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। কালো কুচকুচে রং আর মুখের আকৃতি দেখে সুমন্ত্রের বুঝতে বাকি রইল না কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তাঁরা।

'আপনারা এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছেন কোন্ সাহসে? জানেন, ডাক্তারের অপারেশন্ রুমে বিনা অনুমতিতে ঢুকলে কত বড় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে?'—ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন ডাক্তার চিরঞ্জীব।

'জানি। কিন্তু ডক্টর চিরঞ্জীব, আপনি কি এখানে সত্যি ডাক্তারি করছেন?' ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল ফিশার।

বাধা দিয়ে চিরঞ্জীব বললেন, 'একই কথা। আমার এটা রিসার্চ। এ রিসার্চও ডাক্তারিরই একটা অঙ্গ।'

'কিন্তু এত গোপনে—এত সন্তর্পণে? আর—'

এতক্ষণে সুমন্ত্রও যেন কথা বলার সাহস পেল। বলল, 'আর চুরি করে ধরে এনে যাদের ওপর আপনার এই অমানুষিক রিসার্চ চালাচ্ছেন, তাদের কথা একবার ভেবেছেন? জানেন এটা কত বড় অপরাধ?'

ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল ডাক্তার চিরঞ্জীবের মুখে। 'আপনারা ছেলেমানুষ, সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই পৃথিবীতে অনেক কিছু শিখবার আছে, তার অনেক কিছুই আপনাদের এখনও বাকি। কি নিয়ে আমি কাজ করছি তা যদি জানতেন তা হলে ছেলেমানুষি করে আমার নিভৃত তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটাতে আসতেন না।'

এবার রুখে দাঁড়াল ফিশার। বন্দুকে ভর দিয়ে বলল, 'জানি, জানি। আপনার সঙ্গী ঐ মানবাকৃতি হতভাগ্য জীবগুলোকে যখনই দেখেছি, তখনই বুঝেছি আপনার পাণ্ডিত্যের আড়ালে কত বড় শয়তান লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমাকে ঘাঁটাবেন না। সব রকম আটঘাট বেঁধেই আমি আপনার ডেরায় ঢুকেছি। বাইরের বাগানে হট্টগোল শুনতে পাচ্ছেন? ওরা সব বাগানেরই কুলি—যাদের আপনি মানুষ বলে মনে করেন না। পুলিসের সঙ্গে এসেছে ওরা। আমরা না বাঁচালে এখনই ওরা আপনাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

ফিশারের কথা শেষ হবার আগেই বারান্দায় খট্‌মট্‌ আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। পরক্ষণেই কয়েকজন সুসজ্জিত পুলিস অফিসার সবেগে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

ডাক্তার চিরঞ্জীবের বিচারের কথা কাগজে অনেকেই পড়ে থাকবে। তাঁর পক্ষের ব্যারিস্টার তাঁকে পাগল সাজিয়ে মামলা হাল্কা করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চিরঞ্জীবই তাতে বাধা দিয়ে কেস্ নষ্ট করে দেন। তিনি তো পাগল ন'ন, বিধাতার সৃষ্টির ওপরেও যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব এটাই তিনি পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বাধা পড়ায়, আরব্ধ কাজ শেষ করতে পারেন নি তিনি। কাজেই যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজী আছেন।

মানবতার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তাঁকে কঠোর শাস্তি না দিয়ে উপায় ছিল না জজের। কিন্তু...এই ব্যাপারে প্রধান অংশ নিয়ে সত্যি তারা ঠিক কাজ করেছিল কিনা তা নিয়ে এখনও ক্লিশার আর সুমন্ত্রের মধ্যে তর্ক হয়

কিসের রিসার্চ করছিলেন ডাক্তার চিরঞ্জীব ? মস্ত বড় সার্জন তিনি, পৃথিবীর নানা জায়গায় খ্যাতি কুড়িয়ে শেষে রঙ্গিলা পাহাড় চা-বাগানেই বা তিনি এলেন কেন ? বিচারের সময় তাঁর নিজের লেখা বিবৃতিতেই তিনি সেকথা খুলে লিখেছেন।

সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্রোপচারে অসম্ভব দক্ষতা ছিল তাঁর, আর মানবদেহের সবচেয়ে জটিল যে যন্ত্র সেইখানেই অস্ত্রোপচার করার বাহাদুরি দেখিয়েছিলেন তিনি সবচেয়ে বেশি। কোন্ যন্ত্র ? মানুষের মগজ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা আর স্নায়ুর গহন অরণ্য বলা যায় মগজকে। ওর একচুল এদিক-ওদিক্ হলে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। তাই চিকিৎসা শাস্ত্রে মগজ বা ব্রেনের ওপর অপারেশন করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু ছুরি চালাবার এমনই আশ্চর্য হাত ছিল ডাক্তার চিরঞ্জীবের যে মগজের ভিতরও যখন তিনি ও জিনিস চালাতেন তখন মনে হ'ত এ যেন ছুরি-কাঁটা দিয়ে খানা খাওয়ার মতনই একটা সহজ ব্যাপার।

এখন, মগজ সম্বন্ধে যারাই একটু খোঁজ-খবর রাখে তারাই জানে যে জীবজগতে যতরকম প্রাণী আছে তাদের মধ্যে মানুষের মগজই সবচেয়ে জটিল এবং আকারে সবচেয়ে বড়। আদ্যিকালের পৃথিবীতে যেসব প্রাণী বাস করত তাদের মগজ আকারে হ'ত খুবই ছোট। এমন কি সেকালকার সেই অতিকায় সরীসৃপদের মাথার খুলি পরীক্ষা করলে বোঝা যায় ওর মধ্যে, শরীরের তুলনায় মগজের জন্যে কত অল্প পরিমাণ জায়গা থাকত ? ক্রমবিকাশের ফলে জীব যতই উন্নত থেকে উন্নততর হতে লাগল তার মগজও ততই বাড়তে লাগল দিন দিন। এই পরিবর্তন মানুষের ঠিক পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ আদমি প্রাইমেটিস জাতীয় জীবের মধ্যে বেশ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বানর-শিম্পাঞ্জী, গরিলা এরাও এই জাতীয় প্রাণী কিন্তু এই মগজ সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে মানুষের বেলায় এসে। মানুষও অবশ্য প্রাইমেটিসের দলে পড়ে।

যাই হোক, মগজের এই বড় হওয়ার কারণও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা নয়। তাঁরা দেখেছেন মগজকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি প্রায় সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আছে এবং ছিল—সেই আদ্যিকালের প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত। তাই একে বলা হয় পুরোনো যুগের মগজ বা 'পুরোনো মগজ'। কিন্তু মগজের অন্য অংশটি কেবলমাত্র উন্নততর প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়—প্রাচীন প্রাণীদের মধ্যে এর অস্তিত্বই প্রায় ছিল না। মানুষের মগজ যে এত বড় তার প্রধান কারণ হচ্ছে

মগজের এই অংশটি কেবল মানুষের বেলাতেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাই এই অংশটিকে বলা হয় নতুন যুগের মগজ বা সংক্ষেপে 'নতুন মগজ'।

মগজের দু'টি অংশের কোন্‌টি দিয়ে কি কাজ হয়? তাও মোটামুটি বার করেছেন বিজ্ঞানীরা। পরীক্ষা করে জানা গেছে, জীবন-ধারণের মূল কাজগুলি—যেমন ধর শ্বাসকার্য, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, খাবার সংগ্রহ, দেখা, শোনা, শোঁকা ইত্যাদি সব পুরোনো মগজের সাহায্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, বিচার-বিশ্লেষণ, চিন্তাশক্তি—এ সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করে নতুন মগজ। মানুষ যে-কেন অন্য প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এ থেকেই তার কারণ জানতে পারা যায়। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তার এই অতিবর্ধিত নতুন মগজ।

এই পর্যন্ত কোন গোলমালই নেই। কিন্তু এর পরের ব্যাপারটিই হচ্ছে আসল। মগজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে ডাক্তার চিরঞ্জীবের মনে হ'ল, এই-ই যদি হয়, তা হলে কোনও মানুষের মাথা থেকে নতুন মগজটা কোন রকমে সরিয়ে ফেলে যদি তার জায়গায় অন্য কোন প্রাণীর অপেক্ষাকৃত কম পুষ্ট মগজ অনেকটা গ্রাফটিং-এর মত করে বসিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে চেহারার দিকটা ঠিক মানুষের মত থেকেও, বুদ্ধিবৃত্তির দিক্ দিয়ে সে লোকটি হয় তো ঐ প্রাণীর গুণাগুণ পেতে পারে। এরপরে, এই পরীক্ষাই শুরু করলেন তিনি।

অতি মারাত্মক এই পরীক্ষা। কিন্তু নিজের সার্জারি বিদ্যার উপর অসাধারণ বিশ্বাসই তাঁকে এই অসমসাহসিক কাজে প্রণোদিত করল। আর যাদের নিয়ে তাঁর পরীক্ষা চলবে সেই হতভাগ্য লোকগুলো?—বিজ্ঞানের খাতিরে তাদের বলি দেওয়াই ঠিক করলেন তিনি।

কিন্তু এমন একটা মারাত্মক পরীক্ষা (এবং অপরাধমূলক পরীক্ষা) তো যেখানে সেখানে চালানো যায় না! অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষে তিনি পছন্দ করলেন এই রঙ্গিলা পাহাড়ের চা-বাগান। সভ্য জগৎ থেকে অনেকটা দূরে এই নিরিবিলি বন-প্রান্তরে বসেই তিনি চালাবেন তাঁর গবেষণা বা রিসার্চ। লোকের চোখে যাতে কোন রকম সন্দেহ না জাগে। তাই প্রথমে এলেন চা-বাগানের ডাক্তার সেজে। তারপর সে কাজে ইস্তফা দিয়ে নীলকুঠিটা কিনে নিয়ে শুরু করলেন তাঁর সেই রিসার্চ। এ কাজে তাঁর সহায় হ'ল অল্প কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর। এদের মধ্যে একজন ডাক্তার আর একজন নার্স তো তাঁরই সঙ্গে ধরা পড়ে। এদের দু'জনকেই তিনি এনেছিলেন সুদূর মেক্সিকো থেকে।

যাদের ওপর পরীক্ষা চালাবেন তাদেরকেও ডাক্তার চিরঞ্জীব নিয়ে এলেন

বাইরে থেকে। গোড়াতেই স্থানীয় কুলি-বালকদের ওপর হামলা করতে সাহস হয় নি তাঁর। হলে হয়তো আরও সহজে ধরা পড়তেন, কিছু করবার আগেই।

যে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন তারা ছিল তাঁর প্রথম পরীক্ষার উপকরণ। এদের একজনকার মাথা থেকে নতুন মগজ তুলে নিয়ে তিনি সেখানে বসিয়ে দিয়েছিলেন শিম্পাঞ্জীর মগজ। আর একজনের মাথার খুলিতে ভরে দিয়েছিলেন কুকুরের মগজ। এই রকম আরও কয়েকটা জানোয়ারের মগজ ব্যবহার করা হয়েছিল। সুমন্ত্রের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনে ডাক্তার চিরঞ্জীবের সঙ্গী ছিল এই শিম্পাঞ্জী-মানব। তাই তার চেহারা মানুষের হলেও হাবভাব ছিল শিম্পাঞ্জী-সুলভ। এই শিম্পাঞ্জীকেই ডাক্তার চিরঞ্জীবের কুকুর-মানুষ জঙ্গলের মধ্যে তাড়া করে কিভাবে গাছে তুলেছিল আর তলা থেকে ধমকাচ্ছিল সে দৃশ্যও সুমন্ত্র দেখেছিল ফিশারের সঙ্গে। মানুষ যেমন করে জন্তু পোষে, আদর দেয়— ডাক্তার চিরঞ্জীবও ঠিক তেমনি করে এই সব হতভাগ্য মানুষগুলোকে আদর করে পুষতেন। তাই তারা ছিল তাঁর একান্ত অনুগত।

ডাক্তার চিরঞ্জীবের পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক এর বিপরীত পরীক্ষা— জীব-জন্তুর মাথা থেকে মগজ বার করে নিয়ে সেখানে কৌশলে মানুষের নতুন মগজ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কিনা। তা হলে, চেহারায় নিকৃষ্ট জীব হয়েও তারা মানুষের মত বুদ্ধি পেতে পারে হয়তো। তাঁর বাগানের চিড়িয়াখানায় এইজন্য সংগৃহীত হচ্ছিল নানান্ জাতের প্রাণী এবং ইদানীং যে এত কুলি-বালক উধাও হচ্ছিল তারও কারণ ছিল এই। কিন্তু এ পরীক্ষা তিনি শেষ পর্যন্ত শুরু করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না—তোড়জোড় করেছিলেন মাত্র।

কি করে ধরা পড়লেন ডাক্তার চিরঞ্জীব? ধরা পড়লেন জার্মান যুবক ফিশারের হাতে। ইয়োরোপে থাকতেই উইলহেলম ফিশার তাঁকে জানত, তারপর সিঙ্গাপুরে তাঁদের মধ্যে পরিচয় হয়। ঘটনাচক্রে সেই ফিশারই যে এখানে, এই সুদূর চা-বাগানে চাকরি নিয়ে আসবে তা কি করে জানবেন তিনি? আর নিলেই বা! তাঁর ডাক্তারী বিদ্যার উপর অগাধ শ্রদ্ধাই ছিল ফিশারের।

কিন্তু এই শ্রদ্ধাই হ'ল কাল। অসুখ-বিসুখ করলে ফিশার তাদের চা-বাগানের ডাক্তারের কাছে না গিয়ে হাজির হত ডাক্তার চিরঞ্জীবের কাছে। এই সময়েই নীলকুঠির কাণ্ড-কারখানা তার চোখে পড়ে, সন্দেহের উদ্রেক হয় তার মনে। তারপর কিছুদিন নজর রেখে রেখে একদিন আসল ব্যাপার ধরে ফেলে সে।

তারপর? তারপর—বিজ্ঞান যতই বড় হোক, মানবতা তার চেয়েও বড়।

ভাগুবাবু ও ফটিকগির রহস্য

ভাগুরায়ণ বাবুর বাবা ছিলেন মস্ত পয়সাওয়ালা লোক। সে যুগের পক্ষে বেশ সচ্ছল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও লোকটি ছিলেন সংস্কৃতিবান। বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। কারও ছেলে হলে, (মেয়ে নয়, —মেয়েদের তিনি পছন্দ করতেন না) তাদের জন্য নতুন নাম ঠিক করে দেওয়া ছিল তাঁর একটা নেশা—ইংরেজীতে যাকে বলে 'হবি'। বাংলায় যে সব নামের চল নেই অথচ তাঁর কানে ভালো লাগত সেই সব নাম বেছে বেছে নিয়ে, তিনি আত্মীয়বন্ধুদের পুত্রপৌত্রদের উপহার দিতেন। যেমন ধর—সুভ্রাট, ঋচীক, শতজ্যোতি, সৌবল, বীতিহোত্র, উশীনর, সুপ্রতিম, শুচিব্রত, অবিক্ষিৎ, শৌনিক, সৌতি, পুলস্ত্য, ধুন্ধুমার, পৌষ্য, শঙ্খমেখল, উদ্দালক—এই রকম সব ভালো ভালো নাম। একবার একটি ছেলের নাম রেখেছিলেন কৌণকুৎস। সে কিন্তু তাঁর সম্মান রাখে নি, বছর দশেক বয়স হতেই নিজের নামটা পালটে নিয়েছিল।

যাই হোক, তাঁর নিজের যখন ছেলে হ'ল তখন তিনি মুদ্রারাক্ষস বইখানা পড়ছিলেন। ঐ বইয়ের ভাগুরায়ণ নামটা তাঁর ভালো লাগল, তাই ছেলের নাম রাখলেন ভাগুরায়ণ।

কিন্তু সাধারণ লোকে সাহিত্যের অতশত কি বোঝে? মুদ্রারাক্ষসই বা ক'জন পড়েছে? ফলে ভাগুরায়ণ অচিরে হয়ে দাঁড়াল ভাগু এবং বয়স বাড়ার সঙ্গেও তার সে নামের কোন পরিবর্তন হ'ল না। সবাই বলত ভাগুবাবু। আমরা, যারা ওঁকে একটু সমীহ করতাম, তারা বলতাম ভাগুদা।

ভাগুবাবু তাঁর পণ্ডিত বাবার কাছ থেকে শুধু নামটাই পান নি—সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন কলকাতা শহরের বুকে কয়েকখানা বাড়ি আর ব্যাঙ্কে জমানো বেশ কিছু টাকা। কাজেই নাম নিয়ে মাথা ঘামানো বা তা বর্জন করে বাপকে অসম্মান করার কোন প্রশ্ন ওঠে নি তাঁর মনে। এখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠা ছাড়িয়েছে। মাথায় টাক পড়ে চুল অল্পই অবশিষ্ট আছে। ছোটখাট একটা ভুঁড়িরও মালিক হয়েছেন তিনি। বেঁটেখাটো, হৃষ্টপুষ্ট চুকচুকে চেহারা।

কাজকর্ম কিছুই করতে হয় না। বাড়িভাড়া আর ব্যাঙ্কের সুদ থেকে স্বচ্ছন্দেই দিন চলে যায়। বরঞ্চ একটু অতিরিক্ত স্বচ্ছন্দেই বলা চলে,—বাড়ি-ভাড়া দিন দিন যা বাড়ছে!

তবে তাঁর সময় কাটে কি করে? না, ভাগুবাবুর কোন বদ্ খেয়াল-টেয়াল নেই। বাপের মত পণ্ডিত না হলেও তিনিও বিদ্যানুরাগী এবং বহু বিষয়ে তাঁর কৌতুহল অদম্য। সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, হস্তরেখা-বিচার, পরলোকতত্ত্ব—সবেতেই তাঁর প্রবল আগ্রহ। যা শোনেন তাই-ই বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান অর্থাৎ অ্যাস্ট্রনমি চর্চাও শুরু করেছেন। সন্ধ্যার পর আকাশের তারা দেখে তাঁর অনেকটা সময় কাটছে। একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড দূরবীন কিনতে পাওয়া যায় কিনা তারও খোঁজ করছেন চোরা-বাজারে। আর এই জন্যই মাঝে মাঝে আমারও ডাক পড়ছে তাঁর ওখানে। না না, চোরাবাজারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার অপরাধ—আমি একটু অঙ্কটঙ্ক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান জানি আর কলেজে ছাত্রদের ঐ বিষয়েই পড়াই।

সুযোগ যখন জোটে ভালো ভাবেই জোটে। এখানেও ঘটল তাই। ভাগুবাবু পারতপক্ষে বাঙ্গালীকে বাড়ি ভাড়া দিতেন না—তাঁর ভাড়াটেরা বেশির ভাগই ছিল দক্ষিণ ভারতীয়। (ভাড়াটে হিসেবে ওরাই যে আইডিয়াল অর্থাৎ আদর্শ তা কলকাতার যে কোন পেশাদার বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে)। এই রকম এক ভাড়াটে ছিলেন ইয়েস্ ইয়েস্ ওড্রপড্ডু বেঙ্কটকৃষ্ণণ। নামটা উচ্চারণ করতে ভাগুবাবুর একটু অসোয়াস্তি হ'ত, কিন্তু তাতে ওঁদের বন্ধুত্বের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নি। আর, বলতে কি, আর সব ভাড়াটেদের চাইতে এই বেঙ্কটকৃষ্ণণের সঙ্গেই ভাগুবাবুর ভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।

এই বেঙ্কটকৃষ্ণণের বাড়িতেই অতিথি হয়ে এসেছিলেন তাঁর শ্যালক ডক্টর শেষাদ্রি মহাসমুদ্রম্। কলকাতায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কি একটা কনফারেন্স হচ্ছিল, তারই ডেলিগেট হয়ে। দক্ষিণ ভারতের লোক হলেও এঁর কর্মস্থল হচ্ছে মধ্যভারত। সেখানকার ফটিকগির অবজারভেটারী অর্থাৎ মান-মন্দিরের তিনিই ডিরেক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ। ফটিকগির অবজারভেটারীর নাম শুনেছিলাম। কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়, ওখানকারই এক ধনী ভদ্রলোক, জাতে পার্শী,—দেদার টাকা খরচ করে এই মানমন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন। এখানে নাকি অনেক দুষ্প্রাপ্য যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। প্রধান দূরবীনটিও

উল্লেখযোগ্য। এ হেন একটা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শুনে স্বভাবতঃই তাঁর প্রতি আমারও একটু সম্ভ্রম হ'ল।

ভাগুবাবুর মারফৎ আলাপেরও সুযোগ হ'ল। হাসিখুশি, অমায়িক ভদ্রলোকটি। আর চমৎকার বাংলা বলেন। শুনলাম, প্রথম জীবনে কলকাতায় থেকেই পড়াশোনা করেছিলেন, পরে বিলেত গিয়ে আরও অনেক পাশ-টাশ করে এসেছেন। ভাগুবাবুও তাঁর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিলেন। ডক্টর মহাসমুদ্রমেরও কেন জানি না, ভাগুবাবুকে খুব পছন্দ হয়ে গেল। তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নয়, কারণ ভাগুবাবুর উৎসাহ যতটা ছিল বিদ্যে ঠিক ততটা ছিল না—তাঁর স্বভাবটার জন্যই হয় তো। সপ্তাহ খানেক কলকাতায় থেকে তিনি চলে গেলেন ফটিকগিরে। আমরা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে তাঁকে সি-অফ্ করে এলাম। তাতে তিনি ভারি খুশি।

সেদিনটা ছিল কিসের একটা ছুটির দিন। একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে ঈজি-চেয়ারে শুয়ে আছি, হঠাৎ ভাগুবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "এই বিশু, সেদিন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি নিয়ে কি যেন বলছিলে, ভুলে গেছি।"

হেসে বললাম, "কি হবে স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? তার চেয়ে এই ডিটেকটিভ গল্পটা পড়ুন, ভাল লাগবে।"

"না না, ঠাট্টা নয়। তুমিই না সেদিন বলেছিলে পারা অত ভারী কেন—ওর স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি বেশি বলেই তো?"

"তাই বটে। কোন্ জিনিস জলের চাইতে কতগুণ ভারী তাই দিয়েই মাপা হয় তার স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি। বাংলায় ওকে বলে আপেক্ষিক গুরুত্ব। ব্যাপারটা কেমন জানেন? ধরুন, খানিকটা সোনা নিয়ে দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করলেন। এবার যদি ঐ সোনাটাই জলের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে আবার ওজন করেন দেখবেন সোনার ওজন আগের ওজনের চাইতে ১৯$\frac{১}{২}$ ভাগের এক ভাগ কমে গেছে। সোনা তার সমান আয়তনের জলকে সরিয়ে দেওয়ায় ঐ রকম হচ্ছে। অর্থাৎ সমান আয়তনের জলের যা ওজন সোনার ওজন তার ১৯$\frac{১}{২}$ গুণ। আমরা বলি সোনা জলের চেয়ে ১৯$\frac{১}{২}$ গুণ ভারী। বিজ্ঞানীরা এ রকম প্রায় প্রত্যেক জিনিসেরই স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি মেপে দেখেছেন—খাঁটি অবস্থায় তা সব সময় সমান। সোনা যদি খাঁটি না হয় তা হলে তা আর জলের চেয়ে ১৯$\frac{১}{২}$ গুণ ভারী হবে না। আর্কিমিডিসের সেই গল্প শুনেছেন বোধ হয়? ঐ রকম

জলের চেয়ে পারা ১৩½ গুণ ভারী, লোহা ভারী প্রায় ৭⅘ গুণ, সীসে ১১⅓ গুণ ভারী।"

ভাগুবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, "বাঃ !"

আবার বললাম, "তা হলেই বুঝুন। ধরুন আপনাকে খানিকটা জল, খানিকটা পারা, খানিকটা লোহা, খানিকটা সোনা আর খানিকটা সীসে দিয়ে সঙ্গে কয়েকটা এক মাপের চামচে দিয়ে দেওয়া হ'ল। আপনি এক এক করে প্রত্যেকটা থেকে এক এক চামচ তুলে নিলেন। কি দেখবেন ? দেখবেন জলের চামচেটা কি রকম হাল্কা লাগছে, আর তার তুলনায় লোহা বেশ ভারী লাগছে, সীসে আর পারা লাগছে আরও ভারী, আর সোনা ভীষণ ভারী।"

ভাগুবাবু আবার বললেন, "বাঃ !"

আমারও তখন বক্তৃতার নেশা চেপে গেছে। বললাম, "সাধারণতঃ দেখা গেছে যে কোন জিনিস যখন খুব ঘন হয় তখন তার স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটিও বেড়ে যায়। চিনি জলে গুলে চিনির রস করলেন। সে রস পাতলাও হতে পারে, আবার খুব ঘনও হতে পারে। ঘন রস পাতলা রসের তুলনায় অনেক ভারী লাগবে। সাধারণতঃ গ্যাস এবং তরল পদার্থের বেলাই এ জিনিসটা টের পাওয়া যায়।"

ভাগুবাবু খুব খুশি হলেন মনে হ'ল। ঐ ওঁর স্বভাব ; হঠাৎ মাথায় একটা কিছু এসে গেল, ভয়ানক কৌতূহল হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন সেটা মেটাতে। আর মিটলে পরেই খুশি। বললেন, "আজ আসি ? তুমি পড়।"

পূজোর ছুটি প্রায় এসে পড়েছে। একঘেয়ে জীবন আর ভালো লাগছে না, ভাবছি কোথাও ঘুরে আসব। হঠাৎ ভাগুবাবুর টেলিফোন।

কি ব্যাপার ? ভাগুবাবু বললেন, "ব্যাপার কিছু নয়। ফটিকগির থেকে ডক্টর মহাসমুদ্রম্ নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর ওখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আসবার জন্য। তাঁর নতুন বাংলোয় প্রচুর বাড়তি জায়গা। দলবল নিয়ে গেলেও আপত্তি নেই। তোমায় নিয়ে যাবার জন্যও বিশেষ করে লিখেছেন ; চল, কয়েকদিন ঘুরে আসি। পাহাড়ী জায়গা, ভালোই লাগবে বেড়াতে। স্বাস্থ্যও শুনেছি ভালো ওখানকার। তা ছাড়া ঐ অবজারভেটারিও দেখা হবে।"

প্রস্তাবটা বলা বাহুল্য লুফে নিলাম এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মালপত্তর ও ভাগুবাবু সহ পৌঁছে গেলাম ফটিকগিরে।

আসল নাম স্ফটিকগিরি। লোকের মুখে মুখে দাঁড়িয়েছে ফটিকগির। পাহাড়ে ঘেরা নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন ছোট্ট শহর। শহর না বলে গ্রামই বলা উচিত। পাহাড়গুলোতে কোয়ার্ট্জ্-এর ছড়াছড়ি, তাই বোধ হয় স্ফটিকগিরি নাম দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, ভারি ভাল লাগল জায়গাটা।

ডক্টর মহাসমুদ্রম্ অতিথি-সৎকারের ত্রুটি করলেন না। বাংলোর পাশে একটা পুরো মহাল (গেস্ট হাউস) আমাদের দু'জনকে ছেড়ে দিলেন। নিজে তিনি নিরামিষভোজী, কিন্তু আমাদের জন্য আমিষের ব্যবস্থা করতে গেলে আমরাই আপত্তি করলাম।

অবজারভেটারিটা দেখে ভাগুবাবু তো খুব খুশি। কারণ তাঁর কাছে সব কিছুই নতুন আর সব কিছুতেই তাঁর কৌতূহল। ওর লাগোয়া লাইব্রেরীটিও বেশ মূল্যবান্ মনে হ'ল। মোট কথা, কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

বিকেলে একটু রোদ পড়লেই আমরা দল বেঁধে বেড়াতে বেরুতাম, হেঁটেই। পিচ-ঢালা রাস্তা। দু'পাশে নানা জাতের বড় বড় গাছ। তবে শালগাছই বেশি। ছোট একটা পাহাড়ী নদী পাথরের নুড়ির ওপর আছড়াতে আছড়াতে ছুটে চলেছে সশব্দে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় চোখমুখ জুড়িয়ে দিত।

সেদিনও এইভাবে বেরিয়েছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে না। ভাগুবাবু চলেছেন সকলের আগে আগে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছেন তিনি। পরিষ্কার আকাশে তারা উঠলে দেখবেন। কপালে থাকলে, চাই কি, দু'একটা উল্কাপাতও চোখে পড়তে পারে। বছরের এই সময়টাতেই তো আকাশে উল্কা দেখবার সময়।

কিন্তু এমন কাণ্ডও যে ঘটতে পারে কে ভাবতে পেরেছিল? হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন ভাগুবাবু। দৌড়ে গিয়ে দেখি, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন তিনি। কপাল বেয়ে দর্ দর্ করে রক্ত পড়ছে। খানিকটা জায়গা ভীষণ ফুলে উঠেছে সেখানে। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা তাঁর।

অথচ, আশ্চর্য, কোথাও কিছু নেই! কিসে এত প্রচণ্ড আঘাত কেউ বুঝতে পারল না। কেউ কি পাথর ছুঁড়ে মারল? তা হলে সে পাথর যাবে কোথায়? কোন বন্য জন্তু বা বুনো পাখিতে আক্রমণ করল? তাই বা কেমন করে হয়? কেউ-না-কেউ দেখতে পেতই তা হলে। এ অঞ্চলে কিছু বুনো জাত বাস করে শুনেছিলাম, তারাই কি কেউ আড়াল থেকে তীর মারল? কিন্তু তীর তো ব্যুমেরাং নয় যে তাদের হাতে ফের ফিরে যাবে! ছুঁড়লে তা

এখানেই পড়ে থাকত। বন্দুক ছুঁড়লেও শব্দ শোনা যেত। তা ছাড়া কপাল ফুলে ঢোলই বা হবে কেন। তবে কি ভূত এসে চড় মেরে গেল? কিন্তু তা তো আর বিশ্বাস করা যায় না!

বহু কষ্টে টেনে তোলা হ'ল তাঁকে। লোকটি যে এত ভারী কে জানত? আমরা তো তুলতেই পারলাম না। শেষে লোকজন জড় করে কয়েকজন জোয়ান জোয়ান লোক ধরে বহু কষ্টে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল হাসপাতালে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে দেখে বললেন, কোন একটা খুব ভারী জিনিস দিয়ে কপালে আঘাত করা হয়েছে। তবে চোটটা কপাল ঘেঁষে লেগেছে, সোজা-সুজি হলে কপাল ফেটে ছাতু হয়ে যেত। যাই হোক, ওষুধপত্র দিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গাড়ি করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসা হ'ল?

ততক্ষণে ভাগুবাবু অনেকটা সামলে নিয়েছেন। তবে শরীরটা যেন টানতে কষ্ট হচ্ছে তখনও। কোন রকমে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিজেই বাথরুমে গিয়ে কাপড় ছেড়ে ফেললেন। হাত-মুখ ধুয়ে মনে হ'ল শরীরটা এবার বেশ হাল্কা লাগছে। এবার আর বিছানায় না শুয়ে বসবার ঘরে ঈজি-চেয়ারে এসে গা এলিয়ে দিলেন তিনি।

বাথরুমে তাঁর ছাড়া-কাপড়টা ধুয়ে দিতে বলা হ'ল চাকরকে। কিন্তু একটু পরেই সে এসে যা বলল তাতে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। কাপড়টা অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে। এত ভারী যে তুলে নিংড়ানো দূরে থাক, উঁচু করে তুলতেই পারছে না সে। সবাই বাথরুমে ছুটে গেলাম, একে একে সবাই কাপড়খানা ধরে টেনে দেখলাম। কাপড় তো নয়, যেন কয়লা-মাপা এক-মণ পাথর একখানা! কী করে এমন হ'ল!

সে রাতে কাপড় বাথরুমেই পড়ে রইল। পরদিন সকালে ঝাড়ুদার এল বাথরুম ঝাঁট দিতে। ঝাড়ুর উল্টো দিক্ দিয়ে কাপড়টাকে খুঁচিয়ে এক কোণে ঠেলে দিল সে, তারপরই একটানে সেটা তুলে বাইরে ফেলে দিল। অবাক্ কাণ্ড। কাপড়খানা আবার যেমন ছিল তেমনি স্বাভাবিক,—হাল্কা!

কিন্তু কাপড় হাল্কা হয়ে গেলে কি হবে, ঝাড়ুদার তার কাজ শেষ করতে পারল না। দিব্যি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, হঠাৎ ঝাঁটা অচল হয়ে গেল। মেঝেতে জল ঢেলে যতই ঝাঁটা দিয়ে ধুলো আর জল সরাতে যায় ততই ঝাঁটা কিসে আটকে যায়, একটুও ঠেলা যায় না তাকে। বেচারা খানিকক্ষণ চেষ্টা করে, শেষে ভীষণ ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এবারে ডক্টর মহাসমুদ্রম্ নিজে ছুটে এলেন। তন্ন তন্ন করে বাথরুমের মেঝে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন তিনি। সামান্য একটু ধুলোবালি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে। এবারে ঘরে গিয়ে একটা লেন্স নিয়ে এসে তিনি সেই ধুলোবালিগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। একটা ছোট কালো পাথরের কুচির মত কি চোখে পড়ল তাঁর। হাত দিয়ে তুলতে গেলেন, কিন্তু তোলা গেল না সেটা। শক্তিশালী চুম্বকের মত ঘরের মেঝেটা সেই ছোট পাথর কুচিটাকে যেন টেনে ধরে আছে। তার আকর্ষণ থেকে কিছুতেই মুক্ত করা যাচ্ছে না সেটা।

ডক্টর মহাসমুদ্রম্ কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাঁর মনে হ'ল সমস্ত রহস্যটা ওরই মধ্যে রয়েছে, যে ভাবেই হোক তুলতে হবে ওটাকে। ঘণ্টা খানেক বাদে ছোট সাইজের একটা চাকাওয়ালা ক্রেনের মত যন্ত্রের সাহায্যে তোলা হ'ল সেটা এবং সেই চাকাওয়ালা যন্ত্রে বসিয়েই চালান করে দেওয়া হ'ল ল্যাবোরেটরীতে।

ল্যাবোরেটরীতে কি ভাবে ওটা পরীক্ষা করা হয়েছিল আমার ঠিক জানা নেই, তবে সেইখানেই যে সমস্ত রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল সে খবর মহাসমুদ্রমের কাছেই পেলাম। ব্যাপারটা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

অনন্ত রহস্যময় আকাশ। লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলছে সেখানে। আমরা তাদের ছোট একটা প্রদীপের মত দেখি কিন্তু আসলে ওর বেশির ভাগই আকারে বিরাট—আমাদের সূর্যের চাইতেও বড়। অনেক দূরে আছে বলে আমরা শুধু তাদের আলোটুকু দেখে তাদের চিনতে পারি। কিন্তু সে আলোও আজকের আলো নয়। আজ যে তাবার যে আলো দেখছি সেটা হয়তো একলক্ষ বছর আগে ঐ তারা থেকে ছুটে বেরিয়েছিল। সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটতে ছুটতে আজ লক্ষ বছর পরে তা আমাদের চোখে এসে ধরা দিল। তা হলেই বোঝা যায় তারাগুলো কত দূরে।

অথচ আশ্চর্য, বিজ্ঞানীরা এই সব তারা সম্বন্ধে অনেক তথ্য বার করে ফেলছেন। অঙ্ক কষে, ছবি তুলে, আলো পরীক্ষা করে—আরও নানান্ উপায়ে তা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে জানা গেছে—তারাগুলি প্রথম অবস্থায় থাকে এক-একটি গ্যাসের পিণ্ড। তখন সেগুলি তেমন ভয়ানক কিছু নয়। যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই সে গ্যাস চাপ বাঁধতে থাকে। বাঁধতে বাঁধতে ক্রমাগত ঘন হয়ে আসে সেগুলি। সময় সময় এত ঘন হয় যে পৃথিবীতে বসে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না—কারণ ওরকম কোন ঘন জিনিসের সঙ্গে

আমাদেব পরিচয় নেই। তারপর একদিন হয়তো সে তারা নিভে যায়। নিভে গেলেও কিন্তু সে তার গতি হারায় না,— ঐ মরা দেহটা নিয়ে আগের মতই মহাশূন্যে তার নির্দিষ্ট পথে ছুটতে থাকে। আলো না থাকায় তাকে আর আমরা দেখতে পাই না। আমরা ভাবি তার মৃত্যু হয়েছে।

এই সব নিভে-যাওয়া মৃত তারারা অনেক সময় অত্যন্ত ঘন হয়—অর্থাৎ আমাদের বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি যায় অসম্ভব রকম বেড়ে। আকাশে এখন যে তারাটি সবচেয়ে উজ্জ্বল (কালপুরুষের নীচেকার এই তারাটির নাম লুব্ধক বা সিরিয়াস্) তারই কাছ ঘেঁষে এই রকম একটি নিভে-যাওয়া তারা আছে যা এত ঘন যে তার এক চামচ তুলে আনতে পারলে তার ওজন হবে কম করে এক টন অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণ। এর চেয়েও ঘন তারা আকাশে থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তাদের এক একটি ছোট কণার ওজনই হয় তো হবে এক মণ বা দেড় মণ।

এখন, এইসব তারা নিভে গেলেও তাদের সবটা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। তাদের ভিতরের তাপটা থেকেই যায়। তারপর হয়তো অনুকূল পরিবেশে ভিতরের সেই তাপে আর চাপে হঠাৎ একদিন তার ভিতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। তার ওপরের খোলসটা ফেটে চুরমার হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর ভিতরটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। দূর থেকে সেই আলো দেখে আমরা বলি ঐ নূতুন তারা জন্মাল। আসলে হয় তো সেটা ঐ তারার পুনর্জন্ম। তা ছাড়া যে সময় আমরা তার জন্ম হ'ল ভাবছি, জন্ম হয় তো হয়েছে তার লক্ষ বছর আগে। লক্ষ বছর পরে এই আজ তার আলো আমাদের চোখে এসে ধরা দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা নাকি গত একশ' বছরে এইরকম প্রায় দশটা নতুন তারার পুনর্জন্ম লক্ষ করেছেন।

এখন, তারার নবজন্মের সময় যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন তার খোলস ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে। তারপর হয়তো তারই কতগুলো ভীম বেগে ছুটতে থাকে মহাশূন্যে। কোথায় যে তারা হারিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে ওরই খানিকটা টুকরো ছুটতে ছুটতে এর ওর টানে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমাদের সৌরজগতের মধ্যে এসে পড়ল, তারপর ঠিক উল্কারা যে ভাবে এসে পড়ে পৃথিবীর বুকে তেমনি তার একটা টুকরো —হয়তো একটা ছোট্ট কণা এসে পড়ল পৃথিবীর বুকে। কিন্তু আসলে সে

হচ্ছে অত্যন্ত ঘন সেই তারার টুকরো। ওর একটি কণার ওজনই হয়তো কম করে এক মণ দেড় মণ—যা পৃথিবীতে আমরা ভাবতেই পারি না।

এই রকম একটি কণাই কোন রকমে এসে পড়েছিল ফটিকগিরের আকাশে, তারপর পড়বি তো পড় একেবারে এসে পড়ল ভাগুবাবুর কপাল ঘেঁষে। ছোট একটা কুচি, চোখে দেখে মালুমই হয় না, কিন্তু তারই ওজন হয়তো এক মণের ওপর। কপালের ওপর সোজাসুজি না পড়ে কপাল ঘেঁষে পড়ায় ভাগুবাবু রক্ষা পেলেন, কিন্তু ওরই ফলে তাঁর কপাল ফুলে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটল। ঐ কুচিটা বোধ হয় তাঁর কাপড়ে আটকে ছিল, তাই তাঁকে তোলবার সময় অত ভারী মনে হয়েছিল। বাথরুমে তাঁর ছাড়া-কাপড়ের মধ্যে যখন ঐ কণাটা আটকে রইল তখন কাপড়টাকেও হঠাৎ ঐ রকম ভারী লাগল। ঝাড়ুদারের খোঁচায় সেটা যখন মেঝেতে এসে পড়ল তখন কাপড়টা হাল্কা হয়ে গেল, কিন্তু মেঝে থেকে ঐ এক মণ ভারী জিনিসটা ঝেঁটিয়ে ফেলা সাধারণ লোকের কাজ নয়। ঝাড়ুদার ভয় পাবেই তো। তারপর ডক্টর মহাসমুদ্রম্ এসে যখন সেটা তুলতে গেলেন তখনও তাঁর বিপত্তির কথা আমাদের মনে আছে। চুম্বকের আকর্ষণ নয়—অসম্ভব ওজনের জন্যেই তিনি ওটা তুলতে পারেন নি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ল্যাবোরেটরীতে নিয়ে গিয়ে ওটা পরীক্ষার পর আসল রহস্যটা যে ধরা পড়ল এ জন্য মহাসমুদ্রম্‌কে ধন্যবাদ দিতেই হবে। নইলে ভৌতিক ব্যাপার ভেবে ভাগুবাবুকে হয়তো পরের দিনই ওখান থেকে ভাগতে হ'ত। তাঁর আবার পরলোকতত্ত্ব আর প্রেতাত্মার ওপরেও দারুণ বিশ্বাস কিনা!

ঝড়

সকাল থেকেই ভীষণ গুমোট লাগছিল। হাওয়া নেই, অস্বাভাবিক গরম। সেজদা বললেন, "নিশ্চয়ই বিকেলের দিকে ঝড় আসবে। এ তারই দুর্লক্ষণ। এই রকম আগেভাগে আভাস দিয়েই তো ঝড় আসে।"

কানু কাকা কাছে বসেছিলেন। হেসে বললেন, "ঠিকই বলেছ। আমাদেরও তাই ধারণা ছিল বরাবর। কিন্তু এর যে ব্যতিক্রমও আছে সেবার কিরুকট্টার ঝড়ের অভিজ্ঞতার পর থেকে তা জেনেছি।"

"কি রকম? কি রকম? শোনান সে গল্প।"—আমরা ছেঁকে ধরলাম কানু কাকাকে। কানু কাকা নিজেও একজন মেটিরিওলজিস্ট—যাকে আমরা বাংলায় বলি আবহাওয়া-বিজ্ঞানবিদ্। তা ছাড়া পৃথিবীর নানা জায়গায় তিনি ঘুরেছেন,—গল্পের ঝুলি তাঁর অফুরন্ত।

"গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।"—কানু কাকা একটু থেমে, জোর দিয়ে বললেন। "ঘটেছিল ১৯৫২ স্যালে। শোন তবে:

"প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে হনলুলুর আশপাশে কতকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ আছে, তারই একটার নাম কিরুকট্টা। ওখানকার বাসিন্দারা এখন বেশ সভ্য হয়েছে—আমেরিকান্ বা ইয়োরোপীয়ান্‌দের মতই চালচলন শিখেছে। একটা কলেজও খুলেছে আর আমার বন্ধু ভাস্কর রায় ছিল সেখানকার বায়োলজীর প্রফেসর। ভাস্কর রায়ের নাম এদেশের লোক তেমন জানে না, কারণ ও বরাবরই আমেরিকায় মানুষ। ওর শিক্ষাদীক্ষাও সবই হয়েছে ঐ দেশে।

"এই ভাস্কর রায়ের আমন্ত্রণেই আমি কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলাম কিরুকট্টায় বেড়াতে।

"আমি যেদিন সেখানে পৌঁছলাম সেদিন ওখানে জাহাজঘাটেই কেমন বেশ একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম আগের দিন রাতে ঠিক বন্দরেরই কাছাকাছি একটা জাহাজডুবি হয়েছে। মালবাহী

জাহাজ, লোক খুব বেশি ছিল না। ২৪ জন বাদে সকলকেই উদ্ধার করা হয়েছে. কিন্তু উদ্ধার করা যায় নি জাহাজের মাল। ঐ জাহাজে করে ওখানকার কলেজ এবং সরকারী কারখানার জন্য প্রচুর দামী দামী ওষুধবিষুধ আর রাসায়নিক মালমশলা আনা হচ্ছিল ; সে সবই জলের তলায় অদৃশ্য হয়েছে।

"ভাস্কর আমাকে সাদরেই অভ্যর্থনা করল। তবে জাহাজডুবিতে ও যে বেশ বিচলিত হয়েছে তা বুঝলাম। হবেই তো, ওই জাহাজে ওর ল্যাবোরেটরীর জন্যও নানা রকম রাসায়নিক ওষুধবিষুধ আসছিল, সেগুলি হাতছাড়া হওয়ায় কাজের ক্ষতি হবে ভীষণ। আবার কতদিনে ওগুলো পাওয়া যাবে কে জানে! তা ছাড়া ওর মধ্যে নাকি এমন কতকগুলো কড়া ওষুধ ছিল সাধারণ পোকা-মাকড়ের ওপর যার ক্রিয়া মারাত্মক হতে পারে বলে ওর ধারণা। তাই নিয়ে ও গবেষণাও চালাচ্ছিল ওখানে।

"যাই হোক, যা হবার তা হয়েছে, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন লাভ নেই। স্যালভেজ করে জাহাজ তোলা গেলেও ওইসব ওষুধপত্র তো আর উদ্ধার হবে না!

"সকাল বেলাই ভাস্করের সঙ্গে শহরটা একবার ঘুরে দেখলাম: ছোট্ট শহর কিন্তু বেশ পরিপাটি করে সাজানো—যাকে আমরা বলি 'প্ল্যান্ড্ সিটি' বা পরিকল্পিত শহর। বড় বড় অ্যাভিনিউ, দু'পাশে সারিবদ্ধ পাম্ গাছ, পার্ক, ফোয়ারা—কিছুরই অভাব নেই। একটা বড় ক্লক্-টাওয়ারও চোখে পড়ল।

"দিনটা ছিল রবিবার। ভাস্করের ছুটি। ভাস্কর-গিন্নী খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও করেছিলেন ভালোই। দুপুরে খাবার পর ভাবলাম একটু গড়িয়ে নি, বিকেলে বরঞ্চ একটু তাড়াতাড়িই বেরুব। বেশ চমৎকার দিন। এমন শান্ত আবহাওয়া বড় একটা চোখে পড়ে না।

"শোবার পর কয়েক মিনিটও বোধহয় যায় নি, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসতে হল। এ কি কাণ্ড! বাইরে শোঁ শোঁ করে প্রচণ্ড আওয়াজ শুরু হয়েছে। বাতাসের আওয়াজ। প্রবল ঝড় আসছে। ভালো আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্ বলে আমার একটা গর্ব ছিল, এমন সুন্দর দিনে আচমকা এমন ঝড় আসতে পারে তা আমার কল্পনারও বাইরে।

"কিন্তু সত্যি ঝড় এল। আর, বলতে কি, এমন প্রচণ্ড ঝড় আমি জীবনে দেখি নি। মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। সাজানো-গোছানো ছোট্ট শহর কিরুকট্টা নিমেষে তছ্‌নছ্ হয়ে গেল। আমরা কোন রকমে 'ত্রাহি

মধুসূদন' জপ করতে করতে একটা ঘরে জানালা এঁটে বসে রইলাম, আর থেকে থেকে বাতাসের গর্জনে চমকে চম্‌কে উঠতে লাগলাম। মাত্র দশ-পনেরো মিনিটের ব্যাপার। তারপর ঝড় আপনি থেমে গেল। কিন্তু এরই মধ্যে সে যা করবার করে গেছে।

"ঝড় থামলে ক্ষয়ক্ষতি দেখবার জন্য ভাস্কর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। আমিও সঙ্গী হলাম।

"বিকেলে যে সব জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে মুগ্ধ হয়েছি এখন আর তাদের চেনা যায় না। অ্যাভিনিউ-এর দু'পাশে সার-বাঁধা বড় বড় পাম্‌ গাছগুলো ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। পার্কের ফোয়ারা তুবড়ে গেছে। এমন কি, ক্লক-টাওয়ারের মাথাটা ভেঙে ঘড়ি সমেত মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। লোক যে কত চাপা পড়েছে তার ঠিক নেই। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

"এই ব্যাপারের পর স্বভাবতঃই আমাকে আরও কয়েকটা দিন কিরুকট্টায় থাকতে হ'ল। কোথা থেকে, কেমন করে এই আচমকা ঝড় উঠল শহরের কর্তৃপক্ষ তা ভেবেই পেলেন না। স্থানীয় হাওয়া-আপিসের কর্তারা এ নিয়ে তদন্ত শুরু করলেন এবং ভাস্করের কাছে আমার পরিচয় জেনে আমাকেও তাঁদের কাজে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

"নানাভাবে পরীক্ষা চলল। ওখানকার-হাওয়া-আপিসে যত রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আছে সমস্ত নেড়েচেড়ে নানাভাবে নানা রেকর্ড পরীক্ষা করেও কোন হদিস মিলল না। কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। যদি সত্যি কারণ ধরা না যায় তবে এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে তখনও তো কিছু করা চলবে না। তা হলে উপায়?

"সেই কথাই ভাবতে ভাবতে ভাস্করদের কলেজে গিয়ে হাজির হলাম। ভাস্করের বরাবরের একটা স্বভাব, কলেজ ছুটি হলেও সে একটু কিছু কাজ না করে বাড়ি আসতে পারে না। ল্যাবোরেটরীতে গিয়ে দেখি সে তন্ময় হয়ে একটা মাইক্রস্‌কোপ্‌ নিয়ে কি যেন দেখছে।

"আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে বলল, 'একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখবে? সমুদ্রের ধারে নানা রকম জ্যান্ত মরা সামুদ্রিক প্রাণী, শ্যাওলা রোজই ভেসে আসে। আমার রোজকার অভ্যাস—তাদের কিছু কিছু আমি কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাইক্রস্‌কোপ্‌ দিয়ে দেখি। আর কিছু নয়,—এ আমার একটা কৌতুহল মেটানো বা 'হবি'ও বলতে পার। কিন্তু আজ একটা মজার জিনিস দেখছি।

খানিকটা শ্যাওলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা এককোষী প্রাণী, কিন্তু আকারে প্রায় তিন ইঞ্চি।'

"সমস্ত প্রাণিদেহই কতগুলি কোষ দিয়ে তৈরি—যাকে ইংরেজীতে বলে 'সেল্'। আমাদের নিজেদের শরীরও এই রকম কোষ বা সেল জুড়ে জুড়ে তৈরি। হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ সেল. কিন্তু সব প্রাণীই তো আর আমাদের মত বড় নয়—খুব ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদের শরীরে সেলের সংখ্যা অনেক কম। এমন প্রাণীও আছে যাদের শরীর মাত্র একটি সেল বা একটি কোষ দিয়ে তৈরি। এদেরই বলা হয় এককোষী প্রাণী। বলা বাহুল্য, এ সব প্রাণী খুবই ছোট্ট হবার কথা—অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের চেহারা বোঝাই যায় না। তাই অবাক হয়ে বললাম, 'বল কি? এককোষী প্রাণী অর্থাৎ একটা মাত্র সেল দিয়ে যার শরীর তৈরি, সে অত বড় হবে কি করে? তিন ইঞ্চি তো সহজ কথা নয়। মাইক্রস্‌কোপ্ ছাড়াই তিন ইঞ্চি বলছ তো? তা ছাড়া এ সব প্রায় সেই আদ্যিকালের প্রাণী। যেমন ধর অ্যামিবা।'

"ভাস্কর মুখ তুলে বলল, 'এটাকেও দেখতে ঠিক অ্যামিবার মতই মনে হচ্ছে। ঠিক সেই রকম একটি মাত্র কোষই দেখতে পাচ্ছি, মাইক্রস্‌কোপের নীচে রেখেও। অবশ্য অ্যামিবা আদিম প্রাণী হলেও এখনও ওদের বংশধররা পৃথিবী থেকে লোপ পায় নি—জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আজও ওদের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু তারাও ঐ রকম ক্ষুদে প্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়। মাইক্রস্‌কোপ্ ছাড়া তাদের দেখা যায় না। কিন্তু এটিকে তো খালি চোখেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—এই আগাছাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'

"অ্যামিবার কথা আমিও জানি, কলেজে পড়বার সময় মাইক্রস্‌কোপে দেখেছিও। তবুও কৌতূহল হ'ল, বললাম, 'আমায় একবার দেখতে দাও।'

"ভাস্কর সরে বসল। মাইক্রসকোপে চোখ লাগিয়ে দেখলাম বিরাট একটা কোষ। তার একধারে মরা নিউক্লিয়াস অংশটা তালগোল পাকিয়ে রয়েছে, আর ভেতরটা যেন একদম ফাঁপা—বাতাসের বুদ্‌বুদে ভর্তি।

"ভাস্কর বলল, 'প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন কোন অ্যামিবা অবশ্য খুব বড় হ'ত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে—৫।৭ ইঞ্চিও হ'ত। কিন্তু এখন আর সেগুলো নেই। আর এ জীবটাও অ্যামিবা কিনা সন্দেহ। দেহের গঠনেও একটু তফাৎ আছে। হয়তো ওর সমগোত্রীয় কিছু; অ্যামিবারই জাতভাই;—আমাদের ভাষায় ওরই আর একটা স্পিসিস।'

"আমি আরও খানিকক্ষণ মাইক্রসকোপে চোখ রেখে প্রাণীটিকে দেখতে লাগলাম। একটা মাত্র কোষ। তার প্রায় সবটাই ফাঁকা। ভেতরের রস সবটাই বেরিয়ে গেছে, শুধু বাতাসের বুদ্বুদ্ এসে সে ফাঁকটা ভরে রেখেছে।

"রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঐ প্রাণীটার কথাই মনে হচ্ছিল। চোখের সামনে বড় বড় করে ভাসছিল সেই বিরাট বাতাসের বুদ্বুদ্‌টা। হঠাৎ চন্ করে মাথায় একটা সন্দেহ জেগে উঠল। উঠে পায়চারি করতে লাগলাম। সে রাত্রে আর ঘুম হ'ল না আমার।

"ভাস্করের সাহায্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঝড়ের কারণটা আমিই বার করে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, সেই ছোট জীবটিই। অ্যামিবার সেই জাতভাইটিই হচ্ছে ওর কারণ। পরদিন সমুদ্রের ধারে ঘুরে ঘুরে আমরা অসংখ্য ঐ জীবের সন্ধান পেয়েছিলাম। যাকে বলে অগুন্‌তি। হয়তো লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটিই হবে।

"আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম :

"সমুদ্রের অতল তলে কত বিচিত্র জীব এখনও ছড়িয়ে আছে, মানুষ আজও তার সন্ধান পায় নি। অ্যামিবার এই অতিকায় জাতভাইরাও ঐ রকম সমুদ্রের তলায় বাস করত—দল বেঁধে, একসঙ্গে কোটি কোটি। এদের বংশবৃদ্ধির ধরনটা ভারী অদ্ভুত। একটা অ্যামিবা চিরে দেখতে দেখতে দু'টো হয়ে যায়, তারপর দুটোই আলাদা প্রাণী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কে যে মা আর কে যে বাচ্চা বোঝবার উপায় নেই। ঐখানেই শেষ নয়। ঐ দু'টি প্রাণী আবার ভেঙ্গে হয় চারটে, চারটে ভেঙ্গে আটটা, আটটা ভেঙ্গে ষোলটা। এইভাবে ক্রমাগত ওদের বংশ বেড়ে বেড়ে একটা বিরাট উপনিবেশ গড়ে তোলে। কিরুকট্টার কাছাকাছি সমুদ্রের তলায়ও ওদের উপনিবেশ ছিল নিশ্চয়ই।

"রাসায়নিক ওষুধপত্র বোঝাই জাহাজডুবির পর ঐ সব ওষুধের কতক নিশ্চয়ই সমুদ্রের তলায় গিয়ে পড়েছিল। ভাস্কর বলেছিল, ওর মধ্যে এমন সব ওষুধ ছিল যা নাকি পোকামাকড়ের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। হয়তো ঐ রকমই কোন ওষুধের তেজ সহ্য করতে না পেরে ঐ জীবগুলো সমুদ্রের তলা থেকে ওপরের দিকে উঠে আসে। বাতাস ছাড়া কোন জীবই বাঁচতে পারে না। এরাও পারত না। কিন্তু সমুদ্রের তলায় আর কতটুকু জলে-গোলা বাতাস পাওয়া যায়? কাজেই ওদের কাছে তার চাহিদাও

ছিল তদনুযায়ী সামান্য। হঠাৎ সমুদ্রের একেবারে ওপরে ভেসে উঠে ওরা পেল অফুরন্ত বাতাসের ভাণ্ডার। ওদের শরীর এমনভাবে তৈরি যে সমস্ত শরীর দিয়েই ওরা বাতাস শুষে নিতে পারে। পর্যাপ্ত বাতাসের রাজ্যে এসে তাই করতে লাগল ওরা। শরীরে যতটা ফাঁকা জায়গা ছিল ভরপুর হয়ে উঠল বাতাসে। ওদের দেহে যে জলীয় বা রসাল অংশ তার জায়গাও হয়তো দখল করল বাতাস—তাকে বাধা দেবার উপায় ছিল না ওদের। ফলে প্রত্যেকটি প্রাণী বাতাসে ফুলে টইটম্বুর হয়ে উঠল। এভাবে অবশ্য ওরা বাঁচতে পারে না, তা ছাড়া গভীর জলের প্রাণী ওপরে উঠলে ওপরকার অনভ্যস্ত হাল্কা চাপে আপনিই মরে যাবার সম্ভাবনা। ওরাও ওপরে আসার অল্প পরেই পট পট করে মরতে লাগল। কিন্তু সংখ্যায় ওরা ছিল কোটি কোটি। তাই ওপরে উঠে যে পরিমাণ হাওয়া ওরা টেনে নিতে লাগল তাইতেই ঘটল বিপর্যয়।

"কিংকটুর আশপাশের বাতাস হঠাৎ এক সময়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এমন কমে গেল যে আর কহতব্য নয় কিন্তু কোনও জায়গা তো আর বাতাস ছাড়া ফাঁকা থাকতে পারে না, বাতাস কমে গেলেই চারদিক্ থেকে হু হু করে বাতাস এসে খালি জায়গা ভরাট করে দেয়, আর তারই নাম ঝড়। ঠিক এই কারণেই অত্যন্ত আচম্কা এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে উঠেছিল ঐ ঝড়। সত্যি, পৃথিবীতে কত কি অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারে আমরা কল্পনাও করতে পারি না।"

গল্প শেষ করে কানু কাকা একবার যেন একটু শিউরে উঠলেন, হয়তো সেই ঝড়ের কথা ভেবেই।

কুরুকুয়াভিয়ের মন্ত্রপূত পাহাড়

অনেক দিন পরে মেঘলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে এক ঝলক কাঁচা রোদ ঘরের জানলা টপকে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মার্শাল উডরু খুশি হয়ে তাঁর পুরুষ্টু গোঁফের দু'কোণা মোচড়াতে মোচড়াতে ভাবছেন এইবার একদিন শিকারে বেরিয়ে পড়লে হয়। ব্রিগেডিয়ার ক্যাম্বেল্ও অনেক দিন থেকেই সঙ্গী হবেন বলে জানিয়ে রেখেছেন। কেবল গণ্ডগোল বাধিয়েছিল বেয়াড়া আবহাওয়াটা! পুরো সপ্তাহটা ধরে সূর্যের মুখ তো দেখা যায়ই নি, তারপর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই। কুয়াশায় ছেয়ে আছে পথঘাট—তিন হাত দূরের মানুষ চিনতে কষ্ট হয়।

গৃহভৃত্য এক পেয়ালা গরম কফি দিয়ে গেল। উডরু গোঁফের তদারক বন্ধ রেখে তারই সদ্ব্যবহারে লাগলেন। কিন্তু মুখের হাসি-হাসি ভাবটা রয়েই গেল।

হবে না কেন, দেশের মালিক তো এখন তাঁরাই,—মানে তাঁদেরই দল। বহু বছরের রাজতন্ত্র হাঁকিয়ে দিয়ে তাঁরাই এখন দেশের শাসন চালাবার ভার নিয়েছেন। সেদিনের কথা, দু'বছরও হয় নি। খবরের কাগজগুলো বড় বড় অক্ষরে ফলাও করে সে খবর ছাপিয়েছিল:

টোমাটাস্কায় সামরিক অভ্যুত্থান !!

বিনা রক্তপাতে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ভোলাভম্‌বাস্ কর্তৃক শাসনকর্তৃত্ব হস্তগত! প্রিন্স আলসে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অন্তরীণ! —ইত্যাদি—ইত্যাদি।

রাজাকে সরিয়ে কি করে প্রধান সেনাপতি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দেশের সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন সে ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। সেটা আর না-ই বা বললাম। এ রকম তো হচ্ছে আজকাল পৃথিবীর নানা দেশে। রাজা বা রাষ্ট্রপতি, এমন কি প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত ক্ষমতা রাতারাতি বিনা যুদ্ধে কেড়ে নেবার কথা বলছি। কাজেই ভোলাভম্‌বাস্ টোমাটাস্কার প্রেসিডেণ্ট হবেন এবং তাঁর সঙ্গী ও অনুচর উডরু হবেন সেনা-বিভাগের কর্তা, এতে অবাক্ হবার কি থাকতে পারে?

এখন দেশে যুদ্ধবিগ্রহ নেই, কিন্তু সেনাপতির উঁচু মাইনেটা ঠিকই আছে। কাজেই অবসর বিনোদনের জন্য শিকার-যাত্রাটাকেই একটা সৈন্যসুলভ বীরোচিত খেলা বলা যেতে পারে। আর উভরু শিকারী হিসাবেও ফেলনার নয়।

মাইল পঞ্চাশেক জীপে করে যেতে পারলেই সোয়াবারির জঙ্গলে পৌঁছানো যায়। ঢুকতেই একটা বিরাট জলাভূমি, আর তারই আশপাশে পাওয়া যায় হরেক রকম জীবজন্তু—শিকারীর ভাষায় যার নাম "গেম্"।

এবারে তারই আয়োজন করতে হবে। কফির পেয়ালায় চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে তারই ফন্দী আঁটছিলেন মার্শাল উভরু।

হঠাৎ কিড়ি-কিড়িক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। ফোন এসেছে। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ভোলাভম্বাসের ফোন্। এখনই একবার এলে ভালো হয়। জরুরী ব্যাপার।

হঠাৎ আবার কি জরুরী ব্যাপার ঘটতে পারে? এই তো কাল রাতেও দেখা হয়েছে ওঁর সঙ্গে। স্থির পুকুরের জলের মত টল টল করছে রাজ্যে নির্ভেজাল শান্তি। একটা ছোট্ট ইট বা পাটকেল ছুঁড়ে ফেলে সেটাতে একটু মৃদু ঢেউ তুলবে এমন সাহসও নেই কারো। তবে?

কিন্তু এলোমেলো জল্পনা করে লাভ নেই। যেতে যখন হবে যাওয়াই যাক।

প্রেসিডেণ্ট ভোলাভম্বাস্ একটা মস্ত কৌচে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। উভরু ঘরে ঢুকে দেখলেন আরও দু'-চার জন হোমরা-চোমরা লোক ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছেন সেখানে। এবং তাঁদেরই একজনের হাতে একটি পাথরের টুকরো।

লোকটিকে চিনতে পারলেন উভরু। ডক্টর স্টোনব্রেন—রাজ্যের ভূতত্ত্ব বিভাগের বড়কর্তা। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি পাথরটি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন।

"কি দেখলেন?—ঠিক কিনা?"—চোখেমুখে আগ্রহের হাসি নিয়ে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেণ্ট।

হ্যাঁ, ঠিক। পাথর দেখলেই বোঝা যায়। এই সব পাথরেই সোনা থাকে। আর এটাতে মনে হচ্ছে একটু বেশি পরিমাণেই আছে। এই - এই যে রেখা চলে গেছে ফাটলের রেখার মত,—এগুলো নিরেট সোনা। এখানে অন্ততঃ কয়েক গ্রাম সোনা আছে।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান এক কিলোগ্রাম আন্দাজ ওজনের এই পাথরটুকুর

মধ্যেই যদি অত সোনা থাকে তা হলে এ রকম একটা আস্ত পাহাড়ে না জানি কত সোনা থাকবে।"

"ঠিক তা নয় পাহাড়ের সর্বত্রই যে কাটল আর সোনা পাওয়া যাবে তা নয়। তবে অনেক জায়গায় থাকবার সম্ভাবনা। হয়তো কোথাও একটুও পাওয়া যাবে না, আবার কোথাও এর চতুর্গুণ বা দশগুণ পাওয়া যেতে পারে।"

"হুঁ, বুঝলাম,"—প্রেসিডেন্টের মুখে এবার এক ঝলক তৃপ্তির হাসি খেলে গেল,—"অর্থাৎ ঐ পাহাড়টি তা হলে আমাদের চাই।"

"কিন্তু—কিন্তু ..." কে একজন মৃদুস্বরে কি বলতে গেলেন। প্রেসিডেন্ট হো-হো করে হেসে বললেন, "না না, কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। ও শব্দটা দুর্বলের অভিধানের জন্য, আমাদের জন্য নয়। ও পাহাড় আমাদের চাই-ই শুধু ওই পাহাড় নয়, শুনেছি ওখানে ওই রকম আরও কয়েকটি পাহাড় আছে, সেগুলোও আমাদের চাই। সেগুলোও পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং নিশ্চয়ই একেবারে হতাশ হব না সেখানেও। কি বলেন ডক্টর স্টোনব্রেন ?"

স্টোনব্রেন ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

উডরু এতক্ষণ ব্যাপারটা ধরতে পারছিলেন না, এবারে একটু আন্দাজ করলেন এবং সে আন্দাজ যে সঠিক তাও বোঝা গেল যখন ঘরের অপর-প্রান্তে-বসা একটি রোগামত লোককে লক্ষ করে প্রেসিডেন্ট বললেন, "যাক, আপাততঃ বাহবা দিতে হচ্ছে আমাদের বন্ধু চুংলিংকে। অমন ভাবে ঐ নিষিদ্ধ দেশে ঢুকে খোদ ওই মন্ত্রপূত পাহাড়ের পাথর ভেঙ্গে আনা বড় সহজ কথা নয়! সেরা সেরা গুপ্তচরেরা হিমসিম খেয়ে যেত। ও ছাড়া এ কাজ আর কারও করার সাধ্যি ছিল না।"

চুংলিং চোরা কটাক্ষে হাসতে লাগল সলজ্জ ভাব দেখিয়ে। উডরু সমস্ত ব্যাপার বুঝে ফেললেন।

টোমাটাস্কা হচ্ছে উত্তর আমেরিকার প্রান্তসীমার একটি ছোট্ট রাষ্ট্র। খুবই ছোট বলা যেতে পারে, কারণ সাধারণ অ্যাটলাসে ওর উল্লেখই থাকে না। অনেকটা আমাদের দেশের এই সেদিন-পর্যন্ত-জীইয়ে-রাখা নেটিভ স্টেটগুলোর মত। কিন্তু একটু তফাৎ আছে। ছোট হলেও টোমাটাস্কা হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই সেদিন পর্যন্ত ওখানে ছিল রাজতন্ত্র। তারপর সম্প্রতি সামরিক বিদ্রোহ হয়ে ওখানকারই সেনাবাহিনী রাজার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে—সে খবর আমরা আগেই শুনেছি।

এই টোমাটাস্কার অনেকটা প্রতিবেশী রাষ্ট্র হচ্ছে কুরুকুয়াভিয়ে। প্রতিবেশী, কিন্তু দুই রাজ্যের মধ্যে কোন দিক্ দিয়েই কোনও মিল নেই,—না ভৌগোলিক দিক্ দিয়ে, না বাসিন্দাদের আচারে-বিচারে-স্বভাবে। খাড়া পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কুরুকুয়াভিয়ে হচ্ছে দুরন্ত শীতের রাজা,—আশপাশের চাইতে হাজার হাজার ফুট উঁচু এক মালভূমি। একমাত্র তিব্বতের সঙ্গেই ওর কতকটা তুলনা চলে। ওর অনেকটা অংশই বছরের বেশ কয়েকটা মাস সময় বরফে ঢাকা থাকে, কোন কোন অংশ তো সারা বছরই। বাইরের লোকের পক্ষে, অর্থাৎ যারা ও-দেশের হালচাল, আবহাওয়ায় অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষে, গ্রীষ্মকাল ছাড়া অন্য সময় ওখানে দিন কাটানো বেশ কষ্টকর।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কুরুকুয়াভিয়েকে এক কথায় বলা যায় সোনার দেশ। যেমন চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা তেমনি রাজ্যের মাঝখানেও রয়েছে ইতস্ততঃ ছড়ানো অনেকগুলো বড় বড় পাহাড়। এইসব পাহাড নাকি এক এক কথায় সোনার খনি। যে সব পাথর দিয়ে এগুলি তৈরি সেগুলির মধ্যে রয়েছে সোনার আকর—যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন "ওর্"। ওরই ফাঁকে ফাঁকে সোনার সুতোর মত নিরেট সোনা ঢুকানো রয়েছে। শুধুই কি সোনার পাহাড়? ওই সব পাহড়ের আশপাশে যে সব নদী বয়ে যাচ্ছে তারও জলের তলায় বালির কণার সঙ্গে মিশে আছে সোনার গুঁড়ো। ছোট্ট দেশের তুলনায় প্রচুর—প্রচুর সোনা! কাজেই সোনার দেশ বললে আর ভুল বলা হ'ল কি?

এমন যে সোনার দেশ, স্বভাবতঃই তার ওপর বিদেশীর নজর পড়বে। কুরুকুয়াভিয়ের ওপরও কি কারো নজর পড়ে নি? পড়েছে বই কি! কিন্তু পড়লে কি হবে, কুরুকুয়াভিয়েকে রক্ষা করছেন স্বয়ং রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—যাকে ওরা বলে "দেবী কুরুকুয়াশী"। ওরা অর্থাৎ ওখানকার উপজাতি বাসিন্দারা। ইতিহাস বলে, এদের পূর্বপুরুষেরা এক সময় ছিল রেড ইণ্ডিয়ান-দেরই এক শাখা। বহু-বহু শতাব্দী আগে তাদেরই কয়েকজন যাযাবর বৃত্তি নিয়ে এদিক্ সেদিক্ ঘুরতে ঘুরতে শেষে এখানে এসে আস্তানা গাড়ে। এখানকার সোনার সন্ধান নিশ্চয়ই পেয়েছিল তারা, নইলে এই ঠাণ্ডার দেশে কেন আস্তানা গাড়বে? যাই হোক্, ক্রমে তাদেরই সন্তানরা একটি পৃথক্ জাতিতে পরিণত হয়েছে—কুরুকুয়ান বলে তারা এখন পরিচয় দেয় নিজেদের।

কুরুকুয়ানরা জানে, দেবী কুরুকুয়াশী মন্ত্রপূত করে রেখেছেন ওখানকার সমস্ত পাহাড়, সমস্ত নদী, এমন কি সমস্ত মাঠঘাট, বরফস্তূপ—সব কিছু। কেউ ওর

ওপর লোলুপ দৃষ্টি দিলে কিংবা জোর করে ওর কোন কিছু দখল করতে গেলে দেবীর অভিশাপ এসে পড়ে তার ওপর আর তখন যে-সব অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটতে থাকে তাই দেখে বোঝা যায় কত দুর্বার সেই অভিশাপ। সাবেক আমলে টোমাটাস্কার রাজারাও কি কম চেষ্টা করেছেন? কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেন নি। এমন কি চরম বিপর্যয়ের হাতে পড়তে হয়েছিল তাঁদেরকে। সে কাহিনী সবাই জানে। তাই হাতের কাছে এত বড় লোভনীয় ঐশ্বর্য থাকলেও কিছু করবার নেই।

কিন্তু ভোলাভম্বাস্ তো রাজা ন'ন, তিনি হচ্ছেন মিলিটারী প্রেসিডেন্ট। ও সব দেবদেবীর কুসংস্কার তিনি মানেন না—বিশ্বাস করেন না। রাজাকে সরিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিয়েছেন, এখন যে ভাবে হোক, নিজের দেশটাকে বড় করে তুলতে হবে। 'ছল' বা 'কৌশলের' চাইতে 'বল'টাকেই তিনি বেশি বোঝেন, আর সেই মতলবেই আজ ডাক পড়েছে তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের। গুপ্তচর হিসেবে চুংলিং-এর ওপর তাঁর প্রচুর আস্থা। তা চুংলিং সে বিশ্বাসের মর্যদা রেখেছে,—ছদ্মবেশে গিয়ে সোনার পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে আনতেও পিছপা হয় নি।

রুদ্ধকক্ষে পরামর্শ-সভা বসল। প্রেসিডেন্ট আর সবুর করতে চান না। শীত প্রায় আসি আসি করছে। ঠিক এখনই সৈন্যদল নিয়ে চড়াও হতে না পারলে এ বছরটা আর কিছু করা যাবে না।

কিন্তু অনেকেই আপত্তি তুলল। জেদের বশে বড় বিপজ্জনক কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। মানুষের সঙ্গে লড়াই করে হয়তো জেতা যায়, কিন্তু দেবতার সঙ্গে কি লড়াই করা চলে?

শুনে ভোলাভম্বাস্ মৃদু হাসলেন। কুসংস্কার মানবার জন্য তিনি টোমাটাস্কার কর্ণধার হন নি। সংক্ষেপে জানালেন তাঁর অটল সিদ্ধান্তের কথা, আর মার্শাল উডরুকেই নিতে হবে এই অভিযানের ভার।

টোমাটাস্কার সৈন্যবাহিনী আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত। কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক—সবই আছে তাদের এবং যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বোমারু বিমানও আছে, যদিও তা এ ক্ষেত্রে কোন কাজে লাগবে না। পদাতিক বাহিনীকেই যেতে হবে—মার্চ করে, পাহাড় টপকে এবং তার জন্য উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম, রসদ ইত্যাদিও দরকার।

গোপনে গোপনে সমস্ত আয়োজন হ'ল। বড় বড় এয়ারটাইট টিনে ভরা

সংরক্ষিত খাবার নেওয়া হ'ল প্রচুর। উঁচু পাহাড়ে উঠতে হবে, তাই সৈন্যরা অক্সিজেনের আধার বেঁধে নিল পিঠে। আধারগুলি যাতে খুব ভারী না হয়ে যায় সে জন্য যতটা সম্ভব পাতলা টিন দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী করা হ'ল সেগুলি। শীতের সঙ্গে লড়াই করবার উপযোগী গরম আলস্টার, মাথার টুপি—কিছুই বাদ রইল না। জোলো হাওয়ায়,—বিশেষ করে তুষার-গলা জলকণায় পাছে মরচে ধরে যায় সেজন্য জামার বোতামগুলো পর্যন্ত তৈরি হ'ল খাঁটি টিনের চাকতি দিয়ে। টিনে তো আর মরচে পড়বার ভয় নেই। সব কিছু গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে শেষে একদা প্রভাতকালে শুভদিন দেখে মার্শাল উডরু বেরিয়ে পড়লেন তাঁর অনুচরদের নিয়ে এই অসমসাহসিক দিগ্বিজয়ে।

উঠছেন তো উঠছেনই খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে হাজার হাজার ফুট উঁচুতে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। হিমসিম খেয়ে গেলেন উডরু। কিন্তু মিলিটারী ডিসিপ্লিনই হোক বা স্বর্ণকণার লোভই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁকে টেনে নিয়ে এল কুরুকুয়াভিস্যের অভ্যন্তরে।

সেখানে তখন পুরাদমে শীত নামছে। গলে-যাওয়া বরফ আবার জমতে শুরু করেছে। তাপমান যন্ত্রে পারদের লেভেলও সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসছে রোজই।

কুরুকুয়ানরাও খবর পেয়েছে। টোমাটাস্কানদের চাইতে সব দিক্ দিয়েই অনগ্রসর জাতি হলেও বড়দরের একটা আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি তারাও করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে প্রথম পাহাড়টা দখল করবার সময়েই একটা প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তাতে অবশ্য উডরুর ভয় নেই। এই ধরনের উপজাতিদের সঙ্গে তিনি আগেও লড়াই করেছেন। তা ছাড়া নিজেদের বিজ্ঞানসম্মত হাতিয়ার-গুলোর ওপরও তাঁর আস্থা আছে যথেষ্ট।

তবে কি কুরুকুয়ানরা এবারে সত্যি হেরে যাবে? দেবী কুরুকুয়াশীর পক্ষপুটও কি তাদের আশ্রয় দিতে পারবে না? দেবতার অভিশাপ কি তবে নিতান্তই ফাঁকা বুলি?

শেষ পর্যন্ত প্রথম পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়লেন উডরু। একদল কুরু-কুয়ান এসে রুখে দাঁড়াল। যদিও হাতিয়ার তাদের নিতান্ত সেকেলে, তবু পুরো দু'দিন তারা ঠেকিয়ে রাখল টোমাটাস্কার সৈন্যদলকে।

কিন্তু তৃতীয় দিন আর তাদেরকে কিছু করতে হ'ল না। দেবী কুরুকুয়াশী বোধ হয় এতক্ষণ বসে বসে মজা দেখছিলেন, এইবার সজাগ হলেন তিনি।

পাহাড় বেয়ে উডরুর সৈন্যরা অনেকখানি উঠে গেছে তখন। সকলেরই পিঠে অক্সিজেনের আধার বা সিলিণ্ডার—দম নিতে কষ্ট হয় না। শীতটাও আজ একটু বেশিই পড়েছে। বন্‌কনে হাওয়ায় যেন বরফের কুচি ছুটছে। হঠাৎ একজন সৈন্যের পিঠ থেকে অক্সিজেনের আধারটা শব্দ করে ফেটে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল মাটিতে। কি হ'ল কি হ'ল করতে করতে সকলকারই সেই অবস্থা। শুধু কি তাই? সঙ্গে সঙ্গে জামার বোতামগুলোও ছিঁড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। বোতামের বাঁধন আলগা হতেই দমকা হাওয়ায় খুলে গেল—উড়ে গেল গায়ের জামা। এগোবে কি, সৈন্যেরা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে তাঁবুতে ফিরতে পারলে বাঁচে। মন্ত্রপূত পাহাড়ের অদৃশ্য শক্তি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, মানুষ এখানে একেবারে নিঃসহায়।

কিন্তু তাঁবুতে ফিরেও কি রেহাই আছে? বাক্স পেটরা রসদের টিন, তেলের টিন, মাখনের টিন সব তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেছে। একটা ছোট্ট টিনের কৌটো পর্যন্ত আস্ত নেই—সব গলে, ঝরে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চারদিকে। অনেক কালের পুরোনো বাড়িতে নোনা ধরলে যেমন দেওয়ালের চুন, বালি, সুরকি ইট খসে খসে পড়ে—এও সেই রকম আর কি! তফাৎ, সেগুলো হয় ধীরে ধীরে, অল্প অল্প করে, আর এ হয়েছে অকস্মাৎ—সব একসঙ্গে। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়েছে যেন!

দু'দিন অপেক্ষা করলেন উডরু তাঁবুতে। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হ'ল না। তদুপরি থেকে থেকে কুরুকুয়ানদেব উৎপাত চলতে লাগল সমানে। এদিকে দেখা দিল দারুণ খাদ্যাভাব। এয়ার-টাইট টিনে ভরে যে সব খাবার আনা হয়েছিল সেগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। খাবারের সঙ্গে টিনের গুঁড়ো এমন ভাবে মিশে গেছে যে কার সাধ্য তা মুখে দেয়? খিদের জ্বালায় কেউ কেউ শেষে তাই খেতে শুরু করল। কিন্তু খেতে চাইলেই কি খাওয়া যায়? বিষাক্ত হয়ে গেছে সে সব খাবার। যারা তা মুখে দিয়েছিল তারা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ল। বমি করে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ল সবাই। শুধু তারাই নয়, প্রথম আক্রমণে প্রায় খালি গায়ে তুষার-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে যারা ছুটে এসেছিল তাদেরও কম ঠাণ্ডা লাগে নি, তারাও শয্যা নিতে লাগল।

উডরু বুঝলেন কুরকুয়াণী দেবীর অভিশাপ লেগেছে তাঁদের ওপর। তাঁরই মন্ত্রপূত পাহাড়ে বিদেশীর পদক্ষেপের স্পর্দ্ধা সহ্য করতে পারেন নি দেবী। নইলে এমন অসম্ভব অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটতে পারে না। কুসংস্কার বলে সব কিছু উড়িয়ে

দিয়ে কি ভুলটা'ই না করেছেন তাঁরা! মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন, তার ফল এখন টের পাচ্ছেন হাতে হাতে।

চোরের মত চুপি চুপি পালিয়ে এলেন সকলে। না, 'সকলে' বললে ভুল হবে। কিছু সৈন্যকে ওখানেই বিসর্জন দিয়ে আসতে হ'ল। টোমাটাস্কার ইতিহাসে সামরিক ভাষায় এই "রিট্রিট্" আর একটি কলঙ্ককর কাহিনীরূপে স্মরণীয় হয়ে রইল।

কুরুকুয়াভিয়েতে, যতদূর জানি, এই বোধ হয় শেষ সামরিক অভিযান। টোমাটাস্কার সুশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর এই নিদারুণ রহস্যজনক পরাজয়ের কথা চাপা রইল না। সুতরাং ভবিষ্যতে আর কেউ যে ওই রকম দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে ভরসা পাবে না এ তো স্বাভাবিক।

কিন্তু রহস্য কি চিরকালই রহস্য থাকে?

না।

কি করে একজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানী ডক্টর চট্টোরাজ এই রহস্য উদ্ঘাটন করলেন সেই কথা বলে কাহিনী শেষ করি।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরের কথা বলছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর শুভায়ু চট্টোরাজ ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। দেশভ্রমণের বাতিক ছিল তাঁর প্রবল, একটু অবসর পেলেই এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়াতেন। কুরুকুয়াভিয়ের গল্প শুনে সেখানে যাওয়ার অভিলাষ হ'ল তাঁর।

ইতিমধ্যে কুরুকুয়াভিয়েতেও অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। বিদেশী ভ্রমণকারীদের ওদেশে ঢুকতে বাধা নেই এখন আর। কয়েকটি আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে একদিন ডক্টর চট্টোরাজ চলে এলেন সেই শীতের রাজ্যে।

কুরুকুয়ানরা তাদের শেষ বিজয়কাহিনীর গর্ব ভোলে নি। তারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ টোমাটাস্কা বাহিনীর ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্র তারা কিছু কিছু সংগ্রহ করে রেখেছে। ডঃ চট্টোরাজকে তারা সগর্বে তা শুধু দেখালই না, তাঁর বিশেষ অনুরোধে একটা মূল্যবান্ আধারে ভরে তার খানিকটা তাঁকে উপহারও দিল।

তাই নিয়ে চলে এলেন ডঃ চট্টোরাজ।

কিন্তু সর্বদাই তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল টোমাটাস্কা বাহিনীর সেই অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক বিপর্যয়ের কথা। বলা বাহুল্য, ভোলাবমুবাসের মত তিনিও দেবতার অভিশাপ বা পাহাড় মন্ত্রপূত করে রাখার কাহিনী বিশ্বাস করতে পারেন নি। এর ভিতর নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক রহস্য আছে। প্রচণ্ড কৌতূহল পেয়ে বসল তাঁকে। এ রহস্যের কিনারা তিনি করবেনই। এ নিয়ে দস্তুর মত পড়াশোনা শুরু করে দিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও চলল রসায়নাগারে।

ইতিহাসের পাতায়ই খানিকটা আভাস পাওয়া গেল রহস্যের এবং তার কিনারার। নেপোলিয়ন যখন মস্কো অভিযানে যান তখন নাকি তাঁকেও অনেকটা এই ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। দারুণ শীতে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে।

দুটি ঘটনার মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য ডঃ চট্টোরাজের চোখ এড়াল না। আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত তাঁর ল্যাবোরেটরি বাকিটুকু উদ্ঘাটিত করে দিল।

এবারে সেই কথা বলি। একেবারে খাঁটি রসায়ন শাস্ত্রের কথা।

রসায়নের ছাত্র মাত্রেই "অ্যালট্রপি" কথাটির সঙ্গে পরিচিত। পৃথিবীতে কতকগুলি জিনিস আছে যাদেরকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ বা "এলিমেণ্ট"। সংখ্যায় একশ'র সামান্য বেশি। লোহা, তামা, টিন, কার্বন (অঙ্গার), গন্ধক, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন—এগুলি হচ্ছে সেই মৌলিক পদার্থ। মৌলিক, অর্থাৎ যাকে ভেঙ্গে আর অন্য পদার্থ করা যায় না। পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস এই ক'টি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এখন, রাসায়নিক বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে অনেক সময় একই মৌলিক পদার্থ এক বা একাধিক রূপ নিয়েও থাকতে পারে। উপাদানের দিক্ দিয়ে এগুলি একই জিনিস, কিন্তু গুণ বা হালচালের দিক্ দিয়ে আলাদা। যেমন,—কাঠকয়লা, গ্র্যাফাইট আর হীরে। উপাদানের দিক্ দিয়ে এগুলি সবই এক জিনিস—অর্থাৎ অঙ্গার বা কার্বন দিয়ে তৈরি, কিন্তু চেহারায়, গুণে একটার সঙ্গে আর একটার সামান্যই মিল আছে। হীরে আর কাঠকয়লাকে এক জিনিস বলবে কোন্ মূর্খ? কিন্তু রাসায়নিকের চোখে ওরা একই মৌলিক পদার্থ—কার্বন। বিজ্ঞানীরা তাই এদের নাম দিয়েছেন কার্বনের বিভিন্ন অ্যালট্রপি বা রূপ। অ্যালট্রপি কথাটার মানেও "ভিন্ন রূপ"। কথাটা এসেছে দু'টি গ্রীক্ শব্দ

থেকে 'অ্যালস্'— মানে অন্য, আর 'ট্রপস' মানে রূপ। শুধু কার্বন কেন, এ রকম আরও অনেক মৌলিক পদার্থ আছে যারা বিভিন্ন অ্যালট্রপিক রূপ নিয়ে থাকে— ধাতু এবং অধাতু। যেমন গন্ধক, ফস্ফরাস্, টিন ইত্যাদি। এই অ্যালট্রপিক রূপ,— যাকে আরো ভালো ভাষায় বলা হয় 'অ্যালট্রপিজ্‌ম্',—কেন হয় তারও কতকটা কারণ বিজ্ঞানীরা বার করেছেন। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থই তৈরি হয়েছে কতকগুলি অণু দিয়ে। আবার ঐ অণুগুলো তৈরি হয়েছে তার পরমাণু দিয়ে। দেখা গেছে মৌলিক পদার্থ যখন দানা বাঁধে তখন এক একটা বিশেষ জ্যামিতিক নিয়মে সে দানা বাঁধা হয়। যদি কখনও দেখা যায় যে একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলো অণু তৈরী করবার সময় বিভিন্ন ভাবে নিজেদের সাজিয়ে নিতে পারছে তা হলে ঐ প্রত্যেকটি সাজাবার কৌশল অনুযায়ী মৌলিক পদার্থের চেহারাও হবে এক এক রকম—যদিও মূল উপাদানের দিক্ দিয়ে তাদের মধ্যে কোনও তফাৎ থাকবে না শুধু তফাৎ থাকবে গুণের দিক্ দিয়ে। আবার সব সময়ে যে দানা বাঁধবেই এমন নাও হতে পারে

ধাতব টিনও হচ্ছে ঐ রকম একটি মৌলিক পদার্থ যা নাকি বিভিন্ন অ্যালট্রাপিক রূপ নিয়ে থাকতে পারে। এক—দানাদার সাদা পাত টিন, আর এক ধূসর গুঁড়ো টিন। আমরা সাধারণত: যে সব টিন দেখি সেগুলো হচ্ছে পাত টিন,—চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ধাতু। বিস্কুটের টিনের মধ্যে যে পাতলা ধাতুর পর্দা থাকে তাই আসলে এই জাতের টিন। কোন কোন সিগারেটের বাক্সে যে পাতলা রাংতা দিয়ে সিগারেট মোড়া থাকে তাও এই টিন। এই টিন অত্যন্ত নরম ও পাতলা বলে সাধারণ কাজে ওই অবস্থায় বেশি ব্যবহৃত হয় না। লোহার পাতকে পরিষ্কার করে, তরল টিনের মধ্যে চুবিয়ে নিলে, খানিক পরে সে টিন যখন জমে যায় তখন তা লোহার পাতে এমনভাবে আটকে থাকে যে তাকে তখন টিনেরই পাত বলে মনে হয়। একে বলা হয় টিন-প্লেট। এই টিন-প্লেটকেই শতকরা নিরেনব্বই জন লোক টিন বলে জানে।

দেখা গেছে, সাধারণ টিন ১৩.২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপের উপরেই শুধু তার চেহারা বজায় রাখতে পারে। কিন্তু ওই তাপ যদি আরও কমে যায় তখন আর সে আগের চেহারায়—অর্থাৎ সাদা চক্‌চকে ধাতুর পাত থাকে না—ধূসর রঙের গুঁড়োয় পরিণত হতে থাকে, অর্থাৎ যদি হঠাৎ আবহাওয়ার উত্তাপ ১৩.২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে যায় তা হলে টিনের এই অ্যালট্রপিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। ১৩.২ ডিগ্রীর নীচে টিনকে তার পরিচিত রূপে পাওয়া

সম্ভব নয় বলেই এই কাজটি ঘটবে। তখন টিনের দুই অ্যালট্রপিক রূপই আমরা দেখতে পাব, ১৩°২ ডিগ্রী উত্তাপের ওপরে আর নীচে। কিন্তু যদি উত্তাপ হঠাৎ খুব দ্রুত কমে যায় এমন কি শূন্য ডিগ্রীর চাইতেও পঞ্চাশ ডিগ্রী নীচে নেমে আসে তা হলে এই পরিবর্তনও এত আচম্‌কা এবং এত দ্রুত হবে যে সাদা পাত চোখের নিমেষে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে।

এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ায় কুরুকুয়াভিয়ের আবহাওয়া অসম্ভব রকম শীতল হয়ে গিয়েছিল এবং এই পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল হঠাৎ. তাই সঙ্গে সঙ্গে টোমাটাস্কার সৈন্যদের যা কিছু টিনের সরঞ্জাম সাদা টিনের পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল,—তা সে জামার বোতামই হোক অক্সিজেনের আধারই হোক, আর সংরক্ষিত খাবার রাখার এয়ার-টাইট্ টিনের কৌটোই হোক,—মুহূর্তের মধ্যে ধুসর রং নিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়েছিল। অর্থাৎ এক কথায় সমস্ত ব্যাপারটাই হয়েছিল টিনের অ্যালট্রপিজম্-এর কারসাজির দরুন। দেবী কুরুকুয়াশীর কোনই হাত ছিল না ওতে।